কৃষ্ণ-সূর্যসম, মায়া হয় অন্ধকার! যাহা কৃষ্ণ, তাহা নাহি মায়ার অধিকার!!

শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্লেষণ করেছিলেন যে জড়বাদীদের এইভাবে রুখে দাঁড়ানোর কারণ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তীব্রভাবে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, মাংসাহার এবং নেশার বিরোধী। তাদের কাছে, বা কোন মানুষের কাছে এই সমস্ত কার্যকলাপগুলি পরিত্যাগ করা এতই অসম্ভব যে, বিশ্বাস করতে পারে না যে, প্রকৃত ভগবৎ উপলব্ধির প্রভাবেই সেটি হচ্ছে। পূর্বের একটি মামলার উল্লেখ করে

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, "জার্মানিতেও তারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল যে, বড় মানুষটি লস্ এঞ্জেলেসে বসে আছেন, আর এসব অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদের অর্থসংগ্রহের কাজে নিয়োগ করেছেন। তারা মনে করেছিল যে আমার বশীকরণ ক্ষমতা রয়েছে, আর আমি এই সমস্ত ছেলেমেয়েদের দিয়ে আমার নিজের সুখভোগের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছি।" শ্রীল প্রভুপাদ স্মরণ করেছিলেন যে ১৯৬৯ সালে লস্ এঞ্জেলেসের মন্দির যখন কয়েকটি গাড়ি কেনে এবং ভক্তসংখ্যা বাড়তে থাকে তখন প্রতিবেশীরা অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল।

প্রভুপাদ বলেছিলেন যে তিনি তাদেরও কৃষ্ণভাবনাময় সমাজে এসে থাকবার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে তাদের উত্তর সব সময়ই ছিল, – 'না'। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে বিরোধী পক্ষ যতই বাধা সৃষ্টি করবে কৃষ্ণভাবনামৃত ততই প্রসিদ্ধি লাভ করবে। তিনি আরও বলেছিলেন যে এটি হচ্ছে তাঁর অত্যন্ত জোরালো প্রচারকার্যের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন, "কিভাবে বিরোধী পক্ষের সম্মুখীন হতে হয় তা তোমরা জান না।" তাঁর মনোভাব ছিল তখন অত্যন্ত দৃপ্ত এবং সংগ্রাম প্রস্তুত। তিনি প্রবল উৎসাহের সঙ্গে তাঁর শিষ্যদের দেখিয়েছিলেন কিভাবে বিরোধী পক্ষকে পরাস্ত করতে হয়। তিনি কখনও কখনও তাঁর গুরুদেবকে সিংহ-গুরু বলে বর্ণনা করতেন, এবং এখন তাঁর শিষ্যরা তাঁর মধ্যে সেই বলদৃপ্তভাব প্রকাশ পেতে দেখছিল। তিনি বলেছিলেন, "যত বেশি বাধা আসে ততই আমাদের প্রতিরক্ষা করতে হবে।"

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)-এর
প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ইস্‌কনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(কেবলমাত্র সদস্যদের জন্য)

দ্বাদশ বর্ষ ▶ দ্বিতীয় সংখ্যা ▶ এপ্রিল ▶ মে ▶ জুন ২০০৭ ইং

প্রতিষ্ঠাতা ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে, বাংলাদেশ ইস্‌কন গভর্নিংবডি কমিশনার ও গুরুবর্গের কৃপায়

সম্পাদক	ঃ	শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী
নির্বাহী সম্পাদক	ঃ	শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ দাস ব্রহ্মচারী
সহকারী সম্পাদক	ঃ	শ্রী অজিতেষ কৃষ্ণ দাস
		শ্রী রামেশ্বর চরণ দাস

বাংলাদেশ ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রধান উপদেষ্টা	ঃ	শ্রী ননী গোপাল সাহা
বিশেষ উপদেষ্টা	ঃ	শ্রী সত্যরঞ্জন বাড়ৈ, অবসরপ্রাপ্ত ডি আই জি (ভারপ্রাপ্ত)
পৃষ্ঠপোষকতায়	ঃ	শ্রী চিত্ত রঞ্জন পাল
		শ্রী সুদর্শন কৃষ্ণ দাস
স্বত্বাধিকারী	ঃ	ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ
ভিক্ষা মূল্য	ঃ	প্রতিকপি-২০.০০ টাকা এবং বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা- রেজিঃ ডাকে – ১১০.০০ টাকা
গ্রাফিক ডিজাইন	ঃ	প্রসেনজিৎ রাজবংশী ভক্ত

❀ সূচীপত্র ❀

✵ যোগাযোগ করুন ✵

'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে'

৭৯, ৭৯/১, স্বামীবাগ রোড, ঢাকা- ১১০০

ফোন ঃ ৭১২২৪৮৮, ০১৭১৫৭৯১২৬৪

'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে'

৫ চন্দ্রমোহন বসাক স্ট্রীট, বনগ্রাম (ওয়ারী)

ঢাকা- ১২০৩, ফোন ঃ ৭১১৬২৪৯

※ প্রচ্ছদপট ※

ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে ধরে তাঁর কোলের ওপর রাখেন। তারপর সভাগৃহের দ্বারদেশে ভগবান অনায়াসে তাঁর নখের দ্বারা অসুরটিকে বিদীর্ণ করেছিলেন।

নমস্তে নরসিংহায়, প্রহ্লাদাহ্লাদ দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক নখালয়ে॥
কেশব ধৃত-নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে॥

বৈষ্ণব পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ঃ ৫২১; বঙ্গাব্দ ঃ ১৪১৪; খ্রীষ্টাব্দ ঃ ২০০৭ ইং

১২ই মধুসূদন, ৩০শে চৈত্র, ১৪ই এপ্রিল ২০০৭, শনিবার ঃ বরুথিনী একাদশীর উপবাস (ত্রিস্পর্শা মহাদ্বাদশী), মেষ সংক্রান্তি, শালগ্রাম শিলা ও তুলসীতে জলদান আরম্ভ।

১৩ই মধুসূদন, ১লা বৈশাখ, ১৫ই এপ্রিল ২০০৭, রবিবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.৩৮ মি. থেকে ০৯.৫২ মি. মধ্যে।

১৫ই মধুসূদন, ৩রা বৈশাখ, ১৭ই এপ্রিল ২০০৭, মঙ্গলবার ঃ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের আবির্ভাব।

১৮ই মধুসূদন, ৬ই বৈশাখ, ২০শে এপ্রিল ২০০৭, শুক্রবার ঃ অক্ষয় তৃতীয়া, শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের চন্দন যাত্রা আরম্ভ (২১ দিন)

২৩শে মধুসূদন, ১১ই বৈশাখ, ২৫শে এপ্রিল ২০০৭, বুধবার ঃ শ্রীরামশক্তি সীতাদেবীর আবির্ভাব, শ্রীল মধুপণ্ডিতের, তিরোভাব, শ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর আবির্ভাব।

২৬শে মধুসূদন, ১৪ই বৈশাখ, ২৮শে এপ্রিল ২০০৭, শনিবার ঃ মোহিনী একাদশীর উপবাস (উন্মিলনী মহাদ্বাদশী)

২৭শে মধুসূদন, ১৫ই বৈশাখ, ২৯শে এপ্রিল ২০০৭, রবিবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.২৬ মি. তেকে ০৮.৪৪ মি. মধ্যে, শ্রীমতী রুক্মিনী দেবীর আবির্ভাব।

২৯শে মধুসূদন, ১৭ই বৈশাখ, ১লা মে ২০০৭, বুধবার ঃ ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব (গোধূলী পর্যন্ত উপবাস)

৩০শে মধুসূদন, ১৮ই বৈশাখ, ২রা মে ২০০৭, বুধবার ঃ শ্রীকৃষ্ণের ফুল দোল ও সলিল বিহার। শ্রীল পরমেশ্বর দাস ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীশ্রী রাধারমন দেবের আবির্ভাব। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী ও শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যের আবির্ভাব।

১১ই ত্রিবিক্রম, ২৯শে বৈশাখ, ১৩ই মে ২০০৭, সোমবার ঃ অপরা একাদশীর উপবাস

১২ই ত্রিবিক্রম, ৩০শে বৈশাখ, ১৪ই মে ২০০৭, সোমবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.১৭ মি. থেকে ০৯.৪২ মি. মধ্যে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব। শালগ্রাম শিলা ও তুলসীতে জলদান সমাপ্ত।

১১ই পুরুষোত্তম, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ২৭শে মে ২০০৭, রবিবার ঃ পদ্মিনী একাদশীর উপবাস।

১২ই পুরুষোত্তম, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ২৮শে মে ২০০৭, সোমবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.৩৭ মি. থেকে ০৯.৪১ মি. মধ্যে

২৬শে পুরুষোত্তম, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১১ই জুন ২০০৭, সোমবার ঃ পরমা একাদশীর উপবাস

২৭শে পুরুষোত্তর, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১২ই জুন ২০০৭, মঙ্গলবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.১১ মি. থেকে ০৯.৪২ মি. মধ্যে।

২৪শে ত্রিবিক্রম, ১০ই আষাঢ়, ২৫শে জুন ২০০৭, সোমবার ঃ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের তিরোভাব তিথি। শ্রীগঙ্গাপূজা। শ্রীমতী গঙ্গামাতা গোস্বামীর আবির্ভাব।

২৫শে ত্রিবিক্রম, ১১ই আষাঢ়, ২৬শে জুন ২০০৭, মঙ্গলবার ঃ পাণ্ডবা নির্জলা একাদশীর উপবাস।

২৬শে ত্রিবিক্রম, ১২ই আষাঢ়, ২৭শে জুন ২০০৭, বুধবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.১৪ মি. থেকে ০৯.৪৫ মি. মধ্যে।

২৭শে ত্রিবিক্রম, ১৩ই আষাঢ়, ২৮শে জুন ২০০৭, বৃহস্পতিবার ঃ শ্রীল রঘুনাথ দাস ঠাকুরের পানিহাটি চিড়াদধি মহোৎসব

২৯শে ত্রিবিক্রম, ১৫ই আষাঢ়, ৩০শে জুন ২০০৭, শনিবার ঃ শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। শ্রীল মুকুন্দ দত্তের তিরোভাব। শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব।

১লা বামন, ১৬ই আষাঢ়, ১লা জুলাই ২০০৭, রবিবার ঃ শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব।

৯ই বামন, ২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই ২০০৭, সোমবার ঃ শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব।

১১ই বামন, ২৬শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই ২০০৭, বুধবার ঃ যোগিনী একাদশীর উপবাস

১২ই বামন, ২৭শে আষাঢ়, ১২ই জুলাই ২০০৭, বৃহস্পতিবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ০৫.১৯ মি. থেকে ০৯.৪৯ মি. মধ্যে।

১৪ই বামন, ২৯শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই ২০০৭, শনিবার ঃ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব। শ্রীর ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব (দুপুর পর্যন্ত উপবাস)

১৫ই বামন, ৩০শে আষাঢ়, ১৫ই জুলাই ২০০৭, রবিবার ঃ গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন।

১৬ই বামন, ৩১শে আষাঢ়, ১৬ই জুলাই ২০০৭, সোমবার ঃ ভগবান শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর তিরোভাব ও শ্রীল শিবানন্দ সেনের তিরোভাব।

২৪শে বামন, ৭ই শ্রাবণ, ২৪শে জুলাই ২০০৭, মঙ্গলবার ঃ উল্টো রথযাত্রা।

পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুত হোন

আমরা যখন আমাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হই, তখন আমরা অনায়াসে জন্মান্তরের রহস্য সমাধান করতে পারি।

লন্ডনে ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

প্রদত্ত একটি ভাষণের বঙ্গানুবাদ।

দেহিনোহস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

(ভগবদগীতা ২/১৩)

"দেহ বা আত্মার দেহের যেমন কৌমার থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্দ্ধক্যে পরিবর্তন হয়, তেমনি মৃত্যুর পর আত্মা আরেকটি দেহে দেহান্তরিত হয়; ধীর ব্যক্তি কখনও এই পরিবর্তনের দ্বারা মুহ্যমান হন না।"

অধিকাংশ মানুষই শ্রীকৃষ্ণের এই সরল উপদেশটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলেছেন, **ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি**–"ধীর ব্যক্তি দেহের এই পরিবর্তনের দ্বারা মুহ্যমান হন না।" আর অধীর শব্দটির অর্থ তার ঠিক বিপরীত–অতি মুর্খ। তাই, যারা অসভ্য, সংস্কৃতিবিহীন, অশিক্ষিত, মুর্খ, তারা আত্মার দেহান্তর হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তা না হলে অসুবিধা কোথায়?

যে কোন সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন। যেমন, আমার জীবনে কিভাবে আমার পরিবর্তন হয়েছে, তা আমি স্মরণ করতে পারি। আমার মনে আছে, যখন আমি একজন বালক ছিলাম, তখন আমি লাফালাফি করেছি, খেলাধুলা করেছি। তারপর আমি যুবক হয়েছি, এবং আমার বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে নানা প্রকার সুখ অনুভব করেছি। এখন আমি বৃদ্ধ। এইভাবে আমার দেহে কত পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু আমি সেই একই ব্যক্তিই রয়ে গেছি। এই শ্লোকটিতে 'দেহিনো' 'দেহ' শব্দ দুটির মাধ্যমে আমি এবং আমার দেহের পার্থক্য নিরূপণ হয়েছে যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'দেহিনো' শব্দটির অর্থ 'দেহের মালিক', এবং 'দেহ' মানে 'জড় দেহ'।

পূর্ববর্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, "আমরা সকলে, তুমি, আমি এবং এখানে সমবেত সমস্ত সৈন্যসামন্ত ও রাজা মহারাজারা–পূর্বে ছিলাম, এখনও আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবো।" এইটিই শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। কিন্তু মুর্খরা প্রতিবাদ করে বলে–"অতীতে আমি ছিলাম কি করে? অমুক বছরের অমুক তারিখে আমার জন্ম হয়েছে। তার পূর্বে আমি ছিলাম না। বর্তমানে আমি আছি; একথা ঠিক। কিন্তু যখনই আমার মৃত্যু হবে, তখন আর আমার অস্তিত্ব থাকবে না। তাহলে কৃষ্ণ কেন বলছেন যে পূর্বে আমরা ছিলাম, এখন আমরা আছি এবং ভবিষ্যতে আমরা থাকবো? সেটা কি ভুল নয়?"

না, তা ভুল নয়। তা সত্য। আমাদের স্বরূপ চিন্ময় আত্মা, বিভিন্ন দেহে বিরাজ করছে, এবং ভবিষ্যতেও আত্মা বিভিন্ন দেহে বিরাজ করবে। শ্রীকৃষ্ণ যে বলেছেন, তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি –"মৃত্যুর সময় আত্মা আরেকটি দেহে দেহান্তরিত হয়।" সে কথা বুঝতে হবে। আমার পূর্ববর্তী জীবনের কথা আমি ভুলে যেতে পারি, কিন্তু সেটি অন্য বিষয়। ভুলে যাওয়াই আমাদের প্রকৃতি। কিন্তু যেহেতু আমি কিছু ভুলে গেছি, তার অর্থ এই নয় যে, তা হয়নি। না। আমার শৈশবে আমি কত কিছু করেছি যা আজ আর আমার মনে নেই। কিন্তু আমার মা বাবার তা মনে আছে। আমি ভুলে গেছি বলে যে তা হয় নি, তা নয়।

তেমনি, মৃত্যু মানে পূর্ববর্তী জীবনের কথা ভুলে যাওয়া। কিন্তু আত্মার কখনও মৃত্যু হয় না। আমি যেমন আমার কাপড় পরিবর্তন করি। আমার শৈশবে আমি এক রকমের কাপড় পরেছি, আমার যৌবনে আমি আরেক রকমের কাপড় পরেছি এবং এখন আমার বার্ধক্যের সন্ন্যাসীরূপে আমি আরেক রকম কাপড় পরছি। এইভাবে কাপড়ের পরিবর্তন হলেও আমার পরিবর্তন হচ্ছে না; আমি সেই একই ব্যক্তি রয়েছি। তেমনই, দেহের পরিবর্তন মানে আত্মার মৃত্যু বা বিনাশ নয়। এই সরল দৃষ্টান্তটির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আত্মার দেহান্তর বিশ্লেষণ করেছেন।

আমাদের সকলের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব রয়েছে। আমাদের একত্রে মিশ্রিত হয়ে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ভগবান নিত্য এবং আমরাও নিত্য–নিত্যো নিত্যানাং। চেতনশ্চেতনানাম। কিন্তু ভগবানের দেহ অপরিবর্তনীয়; অথচ আমাদের দেহের পরিবর্তন হয় অন্তত এই জড় জগতে। আমরা যখন চিজ্জগতে

ফিরে যাই, তখন সেখানে আর দেহের কোন পরিবর্তন হয় না। শ্রীকৃষ্ণের দেহ চিন্ময়-সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, এবং চিজ্জগতে ফিরে গেলে আমরাও সেরকম দেহ প্রাপ্ত হই।

শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জড় জগতে আসেন, তখন তাঁর দেহের পরিবর্তন হয় না। তাই তাঁর নাম 'অচ্যুত'-'তাঁর কখনও অধঃপতন হয় না।" শ্রীকৃষ্ণ কখনও মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হন না। কেন না তিনি হচ্ছেন মায়ার নিয়ন্তা। এটিই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য। আমরা জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জড়া প্রকৃতির নিয়ন্তা। কেবল জড়া প্রকৃতিই নয়, শ্রীকৃষ্ণ পরা-প্রকৃতিরও নিয়ন্তা। আমরা যা কিছু দেখি, যা কিছুর প্রকাশ হয়েছে, সে সবই শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, ঠিক যেমন তাপ এবং আলোক সূর্যের শক্তি।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি রয়েছে, কিন্তু তারা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত-অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি এবং তটস্থা শক্তি। আমরা, সমস্ত জীবেরা, ভগবানের তটস্থা শক্তি সম্ভূত। অর্থাৎ আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুসারে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিতে থাকতে পারি অথবা তাঁর বহিরঙ্গা শক্তিতে থাকতে পারি। সেই স্বাধীনতা আমাদের রয়েছে। যে কথা শ্রীকৃষ্ণ ভগবদগীতায় বলেছেন-**যথেচ্ছসি তথা কুরু**- "তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই করতে পার।" অর্জুনকে ভগবদগীতা শোনাবার পর শ্রীকৃষ্ণ এই স্বাধীনতা তাঁকে দিয়েছিলেন। তিনি অর্জুনকে জোর করেন নি। জোর করে কোন লাভ হয় না, কেননা জোর করে যদি কাউকে রাজী করান হয়, তাহলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যেমন, আমি আমার শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছি, খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে। **কিন্তু আমি কাউকে নির্দেশ দিয়েছি, খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে**। কিন্তু আমি কাউকে জোর করি না। আমি তাদের একদিন অথবা দুদিন জোর করতে পারি, কিন্তু তারা যদি তার অনুশীলন না করে, তাহলে জোর করে কোন কাজ হয় না।

তেমনই, শ্রীকৃষ্ণ কাউকে এই জড়-জগৎ ত্যাগ করতে জোর করেন না। এখানে আমরা সকলে মায়ার দ্বারা প্রভাবিত, বদ্ধ জীবাত্মা। মায়া বা জড়া প্রকৃতির কবল থেকে আমাদের উদ্ধার করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আসেন। তিনি দেখেন যে, আমরা অনর্থক কত দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি। অনর্থক কেন? কেননা আমরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ। পুত্র যদি দুঃখ কষ্ট ভোগ করে, তাহলে তাতে পিতারও দুঃখ হয়। যেমন, কোন পুত্র যদি পাগল হয়ে যায়, তাহলে পিতার কত দুঃখ হয়। তেমনি, এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমরা কত দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি। তাই আমাদের এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখে শ্রীকৃষ্ণও দুঃখ পাচ্ছেন। তাই তিনি আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য নিজে আসেন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম॥

(ভগবদগীতা ৪/৭)

শ্রীকৃষ্ণ যখন আসেন তখন তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে আসেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা শ্রীকৃষ্ণকে আমাদেরই মত একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করি। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তিনি আমাদেরই মত, কেননা তিনি আমাদের পিতা এবং আমরা সকলে তাঁর সন্তান। কিন্তু তিনি হচ্ছেন সবকিছুর উৎস-**নিত্যো নিত্যানাং, চেতনশ্চেতনানাম**। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি রয়েছে, কিন্তু তাঁর শক্তি অন্তহীন-তিনি পরম শক্তিমান। এখানেই আমাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পার্থক্য। কেউই শ্রীকৃষ্ণের সমান বা শ্রীকৃষ্ণের থেকে বড় হতে পারে না। সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অধীন; তাই সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সেবক-একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভগবদগীতায় বলেছেন-**ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম** "আমিই ভোক্তা; এবং আমিই সবকিছুর মালিক।" সেকথা সম্পূর্ণ সত্য।

সুতরাং আমাদের দেহের পরিবর্তন হচ্ছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দেহের কোন পরিবর্তন হয় না। সে কথা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। তার প্রমাণ হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-**বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন**-"আমি অতীত, বর্তমান, এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সবকিছু জানি।" যেমন, ভগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "আমি এই ভগবদগীতার জ্ঞান কোটি কোটি বছর আগে সূর্যদেবকে প্রথমে দান করেছিলাম।" শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে স্মরণ রাখেন? কেননা তাঁর দেহের কোন পরিবর্তন হয় না। সেটি অতি সরল সত্য।

আমরা ভুলে যাই, কেননা প্রতি মুহূর্তে আমাদের দেহের পরিবর্তন হচ্ছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেও সে কথা স্বীকৃত হয়েছে। প্রতি সেকেন্ডে আমাদের দেহের কোষের পরিবর্তন হচ্ছে। এবং আমরা বুঝতে না পারলেও আমাদের দেহের পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন পিতামাতা বুঝতে পারে না কিভাবে তাদের শিশু সন্তানের দেহের পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু অপর কোন ব্যক্তি এসে শিশুটিকে দেখে মন্তব্য করেন, "ও তোমাদের ছেলেটি কত বড় হয়ে গেছে।"

সুতরাং আমাদের অগোচরেই আমাদের দেহের পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু 'আমি' জীবাত্মা পরিবর্তিত হচ্ছে না, সে কথাটি বুঝতে হবে। আমরা সকলেই স্বতন্ত্র আত্মা এবং আমরা নিত্য, কিন্তু যেহেতু আমাদের দেহের পরিবর্তন হচ্ছে না, সে কথাটি বুঝতে হবে। আমরা সকলেই স্বতন্ত্র আত্মা এবং আমরা নিত্য, কিন্তু যেহেতু আমাদের দেহের পরিবর্তন হচ্ছে, তাই আমরা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি অনুভব করছি।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই পরিবর্তনের স্তর থেকে জীবকে এক নিত্য অপরিবর্তনীয় স্তরে উন্নীত করা। আমরা সকলেই নিত্য, তাহলে কেন আমাদের পরিবর্তন হবে? সেই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা আমাদের উচিত। সকলেই চায় চিরকাল বেঁচে থাকতে; কেউই মরতে চায় না। আমি যদি একটি রিভলবার হাতে নিয়ে আপনাকে বলি, "আমি আপনাকে মেরে ফেলব," তাহলে আপনি তৎক্ষণাৎ চিৎকার করতে শুরু করবেন, কেননা আপনি মরতে চান না। মরে যাওয়া এবং তারপর পুনরায় জন্মগ্রহণ করা খুব একটা সুখের বিষয় নয়। তা অত্যন্ত কষ্টকর। সে কথা আমরা অবচেতনভাবে জানি। আমি জানি যে, আমি মরে গেলে আমাকে আবার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে হবে, এবং আজকাল মায়েরা তাঁদের গর্ভেই সন্তানদের হত্যা করছে। তখন আমাকে আবার আরেকটি মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে হবে। সুতরাং নিহত

হওয়া, মাতৃগর্ভে আবদ্ধ হয়ে থাকা-এগুলো অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। যেহেতু আমাদের অবচেতন মনে সেই সমস্ত দুঃখ কষ্টের কথা মনে রয়েছে, তাই আমরা মরতে চাই না।

তাই এখানে প্রশ্ন ওঠে, আমি যদি নিত্য হই, তাহলে এই অনিত্য জীবনে কেন আমি আবদ্ধ হয়েছি? সেটিই আমাদের প্রকৃত সমস্যা। কিন্তু মূর্খেরা সেই প্রকৃত সমস্যাটিকে এড়াবার চেষ্টা করছে। তাদের একমাত্র, চিন্তা, কিভাবে তারা খাবে কিভাবে ঘুমাবে, কিভাবে মৈথুন করবে এবং কিভাবে আত্মরক্ষা করবে। খুব ভালভাবে এই আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন এর আয়োজন করলেও অবশেষে তাদের মরতে হবেই। সেই সমস্যাটি থেকেই যায়। তারা তাদের আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনের সাময়িক সমস্যাগুলোর সমাধান করার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন হয়েও তাদের প্রকৃত সমস্যাটি নিয়ে তারা মাথা ঘামাতে চায় না। পশু পাখীরাও খায়, ঘুমায়, মৈথুন করে, এবং আত্মরক্ষা করে। তারা যদি শিক্ষা অথবা তথাকথিত সভ্যতা ব্যতীতই এগুলো করতে পারে, তাহলে আমাদের সমস্যাটি কোথায়? সেগুলো সমস্যা নয়। আমাদের প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে যে আমরা মরতে চাই না, কিন্তু তবুও মৃত্যু আসে। কেন? কেননা সেটিই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত সমস্যা। মূর্খ মানুষেরা এই সমস্যাটি সম্বন্ধে সচেতন নয়। তারা মনে করে যে, তাদের অনিত্য সমস্যাগুলো সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। সেকথা শ্রীকৃষ্ণ ভগবদগীতায় পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করেছেন–

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥

(ভগবদগীতা ২/১৪)

আমাদের বহু অনিত্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু সেগুলোকে সহ্য করতে হবে। যেমন যদি খুব ঠাণ্ডা পড়ে। সেটি একটি সমস্যা। আমাদের তখন ভালো খাবারের অন্বেষণ করতে হয়, এবং আগুন জ্বালাতে হয়; এবং সেগুলো যদি না পাওয়া যায় তাহলে আমাদের খুব কষ্ট ভোগ করতে হয়। কিন্তু এই সমস্যাটি অনিত্য। প্রচণ্ড শীত, প্রচণ্ড গরম,–এগুলো আসে এবং চলে যায়। সেগুলো চিরস্থায়ী নয়।

আমার নিত্য সমস্যা হচ্ছে যে আমার অজ্ঞানতাবশতঃ আমাকে জন্মগ্রহণ করতে হচ্ছে, আমি ব্যাধিগ্রস্ত হচ্ছি, আমি জরাগ্রস্ত হচ্ছি এবং অবশেষে আমাকে মরে যেতে হচ্ছে। সেইগুলোই হচ্ছে প্রকৃত সমস্যা। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, **জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম**–"যারা প্রকৃত জ্ঞানবান তাদের জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির দুঃখ দুর্দশা সর্বক্ষণ দর্শন করা উচিত।"

সুতরাং আমাদের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে এক দেহ থেকে আরেক দেহে দেহান্তরিত হবার সমস্যার সমাধান করা। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, পূর্বে আমরা অন্য দেহে ছিলাম, বর্তমানে আমরা আছি এবং ভবিষ্যতে অন্য আরেকটি দেহে আমরা থাকবো। এইভাবে আমরা এক দেহ থেকে আরেক দেহে দেহান্তরিত হচ্ছি। বুদ্ধিমান মানুষেরা জিজ্ঞাসা করেন, "আমার পরবর্তী জীবনে আমি কি রকম দেহপ্রাপ্ত হব?" সেটিই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা। আর আমরা যদি আমাদের পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুত হই, তাহলে পরবর্তী দেহে দেহান্তরিত হওয়ার ব্যাপারে আমরা মুহ্যমান হব কেন?

আমাদের শৈশবে আমরা যদি উপযুক্তভাবে নিজেদের তৈরি করে নিই তাহলে আমরা শিক্ষালাভ করি, তারপর ভালো চাকরি পাই, সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করি। তেমনই, কেউ যদি ভগবানের কাছে ফিরে যাবার জন্য এই জীবনে প্রস্তুত হয়, তাহলে আর বিচলিত হতে হয় না। আমাদের মনে রাখা উচিত, "আমি শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যাচ্ছি। আমি আমার প্রকৃত আলয়, ভগবদ্ধামে ফিরে যাচ্ছি। সেখানে আমাকে আরেকটি জড় শরীর ধারণ করতে হবে না। সেখানে আমি আমার চিন্ময়রূপ প্রাপ্ত হব। আমি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করব, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নাচব, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খাবো।" এইটিই কৃষ্ণভাবনার অমৃত। পরবর্তী জীবনের জন্য যথার্থ প্রস্তুতি।

মরণোন্মুখ মানুষ আর্তনাদ করে, কেননা সে জানে যে তার পরবর্তী জীবনটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে। কর্মের নিয়ম অনুসারে, যারা অত্যন্ত পাপী, তারা ভয়ে আর্তনাদ করে কেননা তারা মৃত্যুর সময় ভয়ঙ্কর সমস্ত জিনিস দেখে। কিন্তু যারা পুণ্যবান, যারা ভগবদ-ভক্ত, তাঁরা মৃত্যুর সময় কোন উদ্বেগ অনুভব করে না।

মূর্খ মানুষেরা বলতে পারে, "পাপীদেরও মৃত্যু হচ্ছে, আর ভক্তদেরও মৃত্যু হচ্ছে, তাহলে পার্থক্যটি কোথায়?" হ্যাঁ, পার্থক্য রয়েছে। একটি বিড়াল তার শাবককে তার ধারাল দাঁত দিয়ে ধরে মুখে করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায়, আবার সেই বিড়ালটি একটি ইঁদুরকেও দাঁত দিয়ে ধরে। কিন্তু তার সেই ধরার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বিড়াল শাবকটি পরম সুখ অনুভব করে মনে করে–"আমার মা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, সুতরাং আমার আর ভয় কি।" কিন্তু ইঁদুরটি মনে করে–"এখন আমাকে মরে যেতে হবে। এখন আর আমার রক্ষা নেই!" এটিই পার্থক্য। তাই যদিও, ভক্তদেরও মৃত্যু হচ্ছে এবং অভক্তদেরও মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু তাদের মৃত্যুতে পার্থক্য রয়েছে। মনে করবেন না যে তারা উভয়ে একইভাবে মারা যাচ্ছে। ভগবদগীতায় (৪/৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

আমরা যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা, শ্রীকৃষ্ণের মন্দির, সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করি, তাহলে আমরা ভগবানের কাছে ফিরে যাবো। এ সবই দিব্য, অপ্রাকৃত। কেউ যদি তা পূর্ণরূপে বুঝতে নাও পারে, কিন্তু কেবল বোঝার চেষ্টা করে, তাহলে সেও জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তাই কৃষ্ণভক্ত হয়ে ঐকান্তিকভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানার চেষ্টা করুন। তাহলে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির সমস্যার সমাধান অনায়াসে আপনা থেকেই হয়ে যাবে।

আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ।

সাধুসঙ্গের প্রণালী-বিচার

— ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সঙ্গই স্বভাবের মূল

সঙ্গ হতে স্বভাব। যে ব্যক্তি যার সঙ্গ করে, তার তদ্রুপ স্বভাব হয়ে উঠে। পূর্ব্বজন্মের সঙ্গরূপ কর্ম্মদ্বারা জীবের যে স্বভাব গঠিত হয়, তাহা আধুনিক জন্মের সঙ্গদ্বারা পরিবর্তিত হয়ে থাকে। সুতরাং সঙ্গই মানব-স্বভাবের মূল। অতএব কতিথ হয়েছে যে,–

"যস্য যৎ সঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ সঃ তদ্‌গুণঃ।"

স্ফটিক মণি যে-কোন বর্ণের নিকট থাকে তাতেও সেই বর্ণ প্রতিভাত হয়, তদ্রুপ যে পুরুষ যে পুরুষের সঙ্গ করে, তাতে তদ্বৎ গুণাগুণ প্রতিভাত হয়।

সাধু-সঙ্গই নিঃসঙ্গত্ব

ভাগবতে বলেছেন,–

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোহধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে।।

(ভাঃ ৩/২৩/৫৫)

অসৎ জনের সঙ্গ করলে ঘোর সংসাররূপ ফলপ্রাপ্তি হয়। কে অসৎ, কে বা সৎ– এ বিষয় বিচার না করেও সঙ্গ-ফল অবশ্য লাভ হয়। সাধুলোকের সঙ্গ করলে নিঃসঙ্গত্ব-রূপ ফলোদয় হয়।

অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ কর্তব্য

অসৎসঙ্গ সম্বন্ধে বিশেষ করে বলেছেন,–

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥

(ভাঃ ৬/৩১/৩৩-৩৪)

সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, হ্রী, যশ, শ দম ও ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য– এ সমস্তই যে অসৎসঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই অসাধু, অশান্ত, মূঢ় ও যোষিৎক্রীড়ামৃগদিগের সহিত সঙ্গ নিতান্ত শোচনীয় জেনে একেবারেই পরিত্যাগ করবে।

সাধুর লক্ষণ; সাধু-সঙ্গই কর্তব্য

কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করলেই যথেষ্ট হবে না। যত্নপূর্ব্ব সৎসঙ্গ করাই আমাদের কর্তব্য। যে-সকল সাধুজনের সঙ্গ করতে হবে, সেই সাধুগণের লক্ষণ বলছেন,–

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদগতচেতসঃ॥
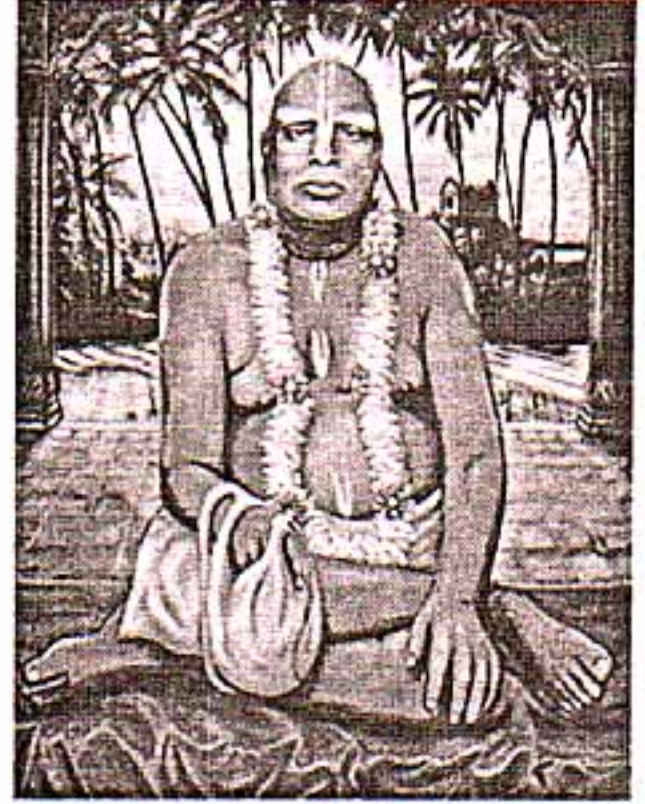
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥

(ভাঃ ৩/২৫/২১, ২৩-২৪)

কপিলদেব কহিলেন, হে মাতঃ। তিতিক্ষাযুক্ত, কারুণিক, সর্ব্বদেহীর সুহৃৎ, অজাত-শত্রু, শান্ত সাধুগণ সাধু ভূষণ। শুদ্ধ ভক্তদিগেরই এই প্রকার স্বভাব। ভক্তগণ মদ্‌গতচিত্ত, সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ-যোগগত বহুবিধ কষ্টাভ্যাস করেন না। সহজে মদাশ্রয়া-কথাদ্বারা মার্জ্জিত অন্তঃকরণে পরস্পর হরিকথা বলেন ও শ্রবণ করেন। হে স্বাধ্বি! সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত সেই সাধুগণ সঙ্গদোষ নাশ করেন। তুমি তাঁহাদের সঙ্গ প্রার্থনা কর।

বেশের দ্বারা নির্ণীত হয় না–সাধু অতি দুর্ল্লভ

আমরা যে-কোন বেশ দেখিয়া কোন ব্যক্তিকে সাধু বলে স্থির করব না। পরচর্চ্চা, পরনিন্দা–এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও আমরা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ না দেখলে কাহাকেও সাধু বলে গ্রহণ করব না। কলিকালে সাধুর বিচার একেবারে উঠে যাচ্ছে। দুঃখের বিষয় এই যে, যাকে তাকে বাহ্যিক বেশ দেখে সাধু বলে সঙ্গ করত আমরা ক্রমশঃ সকলেই কপট হয়ে পড়ছি। আমাদের এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। সাধু অনেক পাওয়া যায় না। সাধু-সংখ্যা আজকাল এত অল্প হয়েছে যে, বহু দেশ ভ্রমণ করেও বহুদিন অনুসন্ধান করে একটি প্রকৃত সাধু পাওয়া দুর্ল্লভ হইয়াছে।

মাধুর্য্য-রসাশ্রিত কৃষ্ণভক্তি অতীব দুর্ল্লভ

মহাদেব দেবীকে বললেন, হে ভগবতি! সহস্র সহস্র মুমুক্ষুদিগের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মুক্ত-লক্ষণ লাভ করেন।

আবার সহস্র সহস্র মুক্ত-জনের মধ্যে কেহ কদাচিৎ সিদ্ধি লাভ করেন। আবার কোটি কোটি সিদ্ধ ও মুক্তজনের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সৎসঙ্গ-সুকৃতিবলে নারায়ণ-পরায়ণ হন। দেখ, নারায়ণ-ভক্ত প্রশান্তাত্মা, অতএব সুদুর্লভ। এখন দেখুন, দাস্য-রসাশ্রিত শুদ্ধ নারায়ণ-ভক্ত যখন এত দুর্লভ, তখন মাধুর্য্য-রসাশ্রিত কৃষ্ণভক্ত যে কত দুর্লভ, তাহা কি বলব।

কৃষ্ণভক্তই পরম সাধু এবং তাঁহার সঙ্গের পরম ফল

উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তই আমাদের পক্ষে পরম সাধু। কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গই আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্ত সংগ আমাদের যে লাভ হয়, তাহা ব্রহ্মা বলেছেন,–

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোহঙ্ঘ্রি-নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥
(ভাঃ ১০/১৪/৩৬)

স্বভাবতঃ বিষয়াবিষ্ট রাগ-দ্বেষ আমাদের সমস্ত সত্ব অপহরণ করছে। আমাদের গৃহ, কারাগৃহ হয়ে পড়েছে। আমরা মোহরূপ অঙ্ঘ্রি-নিগড়ে সর্ব্বদা আবদ্ধ আছি। আমাদের কি দুর্দ্দশা। হে কৃষ্ণ। যেদিন তোমার শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে আমাদের তোমাতে মমতা জন্মে, সেদিন হতে আমরা তোমার জন মধ্যে বসতে পারি। সেদিন হতে আমাদের রাগাদি প্রবৃত্তি আর চোরের ন্যায় আচরণ করে না; পরম বন্ধুবৎ আচরণ করে তোমার ভক্তির চরণে লীন হয়। সেদিন হতে আমাদের গৃহ অপ্রাকৃত হয়ে নিত্যানন্দ দান করে। সেদিন হতে আমাদের মোহ কেবল ভক্তি-সেবক হয়ে আমাদের আত্মোন্নতি বিধান করে।

অতএব ব্রহ্মা আবার প্রার্থনা করলেন,–

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো,
ভবেহত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোহপি ভবজ্জনানাং,
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥
(ভাঃ ১৪/১৪/৩০)

হে কৃষ্ণ! আমি এই ব্রহ্ম-জন্মেই থাকি বা অন্য জন্ম লাভ করি বা পশু-পক্ষী হই, আমার প্রার্থনা এই যে– আমার সেই ভাগ্য লাভ হউক যদ্দ্বারা আমি আপনার ভক্তজনের মধ্যে কেহ হয়ে আপনার পাদপল্লব সেবা করি। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ-ফলেই জীবের এবম্ভূত অসীম অবস্থা লাভ হয়।

সাধুসঙ্গ- সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

সাধুসঙ্গ কি কার্য্য করলে হতে পারে, ইহার বিচার অতীব প্রয়োজনীয়। অনেকে মনে করেন যে, যাঁকে সাধু বলে স্থির করা যায় তাঁর পদসেবা, তাঁকে প্রণতি, তাঁর চরণামৃত সেবন, তাঁর প্রসাদ সেবা এবং তাঁকে কিছু অর্থদান করলেই সাধুসঙ্গ হয়। সেই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা সাধু সম্মাননা হয় বটে এবং তাতে কোন না কোন প্রকার লাভ আছে। কিন্তু তাহাই যে সাধুসঙ্গ তাহা নয়।

সাধুসঙ্গ-লাভের ক্রমোপায়

সাধুসঙ্গ যেরূপে করতে হয়, তাহা বলেছেন,–

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রম-পরায়ণ-শীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥
(ভাঃ ২/৭/৪৬)

'অদ্ভুতক্রম' শব্দে 'শ্রীকৃষ্ণ'। শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তগণ অদ্ভুত-ক্রমপরায়ণ। সেই ভক্তগণের 'শীল' অর্থাৎ 'স্বভাব' ও 'সচ্চরিত্র' যিনি বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করেন, তিনি নিশ্চয় ভগবানের মায়া-শক্তিকে জানতে পারেন, আর কেহ জানতে পারে না। তিনিই কেবল মায়া-সাগর সম্পূর্ণরূপে পার হতে সক্ষম হন। যে কোন স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর, অন্য পাপ-জীব ও পশু-পক্ষী কৃষ্ণভক্তের স্বভাব শিক্ষা করতে পারেন, তিনিই অনায়াসে ভবসাগর পার হবেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভক্তচরিত্র অনুসরণ করে যে অনায়াসে সংসার-সাগর পার হবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? তাৎপর্য্য এই যে, বহু শাস্ত্র-জ্ঞান লাভ করলেও মায়াবল অতিক্রম করতে পারে না। উত্তম জাতিলাভ করলেও কোন চরম লাভ হয় না। শাস্ত্র-বিচারদ্বারা শুষ্ক বৈরাগ্য অবলম্বন করলেও সংসার পার হওয়া যায় না। ধন ও সৌন্দর্য্যের দ্বারাও সে লাভ হয় না। কেবল শুদ্ধ ভক্ত-সাধুগণের স্বভাব ও সচ্চরিত্র বহু যত্নে অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুকরণ করতে পারলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।

বিষয়ীর দৈন্য ও কৃপা-প্রার্থনা–কপটতা মাত্র

বিষয়িগণ সাধুর নিকট প্রণতিপূর্ব্বক বলে থাকেন যে,– "হে দয়াময়! আমাকে কৃপা করুন– আমি অতিশয় দীন-হীন, আমার সংসার-বুদ্ধি কিরূপে দূর হবে?" বিষয়ীর এই বাক্যগুলি কপট বাক্য মাত্র। তিনি মনে জানেন যে, কেবল অর্থলাভই লাভ ও বিষয়-সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীমদ অহরহঃ জাগ্রত আছে। কেবল প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনা ও সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয় ক্ষয় না হয়– এই ভয় হতে তাঁহার নিকট কপট দৈন্য ও কপট ভক্তি এসে উপস্থিত হয়। যদি ঐ সাধু তাঁকে এই বলে আশীর্ব্বাদ করেন যে,– "ওহে তোমার বিষয়-বাসনা দূর হউক এবং ধন-জন তোমার ক্ষয় হউক।" তখনই ঐ বিষয়ী বলবেন,–"হে সাধু মহারাজ! আপনি আমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ করবেন না। এরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল শাপমাত্র সর্ব্বদা অহিতজনক বাক্য।" এখন দেখুন, সাধুগণের প্রতি এরূপ ব্যবহার নিতান্ত কপট।

কপটতাহেতু সাধুসঙ্গের ফল-লাভে বঞ্চিত

জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমাদের কপট ব্যবহারে আমরা সাধুসঙ্গের কোন ফল লাভ করি না। অতএব সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সংপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্নপূর্ব্বক অনুসরণ করতে পারলে সাধুসঙ্গ দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি। এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রেখে প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হয়ে তাঁহার স্বভাব-চরিত্র অবগত হবো এবং যাহাতে আমাদের স্বভাব-চরিত্র তদ্রূপ গঠন করতে পারি, তাহার বিশেষ চেষ্টা করব। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের শিক্ষা।

পুণ্য সংগ্রহের মাস

১৬ জানুয়ারি ১৯৯৭ শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রোদয় মন্দিরকক্ষে প্রদত্ত ভাগবত (৪/২৭/২২-২৩) প্রবচন থেকে সংকলিত

– শ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ

অশুভ কর্মফল মুক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনায় অগ্রসর হওয়ার জন্য নানা সুযোগ ভগবান তাঁর আশীর্বাদস্বরূপ আমাদের দিয়ে থাকেন। বছরে সেই রকম একটি সময় হলো মকর সংক্রান্তির শুরুতে – মাঘ মাস।

তিনটি মাস বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ। যেমন, বৈশাখ মাস হলো বিষ্ণুর উপাসনার জন্য বিশেষ উপযুক্ত সময়। এই সময়ে থাকে নৃসিংহ চতুর্দশী, চন্দনা যাত্রা ইত্যাদি নানা পূজাপর্ব। তারপর আসে কার্তিক মাস বা দামোদর মাস, যখন আমরা পূজাদি সহ কিছু কৃচ্ছসাধন আয়ত্ত করি এবং বিশেষ কোনো কোনো খাদ্য বর্জন করে চলি।

আর তৃতীয় মাস হলো মাঘ মাস–যখন ভক্তরা ভগবানের আরাধনা করে তাঁকে পুষ্পাদি নিবেদন করে থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মাঘ মাসকে শ্রীমাধব বলা হয়েছে। কথিত আছে – "যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।" অর্থাৎ, মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হলে সেটা খুবই শুভ লক্ষণযুক্ত। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তখন তিনি জগন্নাথ পুরীতে ছিলেন। গৌর পূর্ণিমার সময়ে তিনি পৃথিবীতে প্রকটিত হন, কিন্তু এই পুণ্য মাঘ মাসেই তিনি তাঁর পিতামাতার শরীরে প্রবেশ করেন এবং তেরো মাস পরে ফাল্গুন মাসে তিনি ধরাধামে আবির্ভূত হন।

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, পদ্মপুরাণে একটি উল্লেখযোগ্য শ্লোকে মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজা দিলীপকে বলেছেন, "হে রাজন, মাঘ মাসের সকালে স্নান করার অধিকার যেমন সকলেরই রয়েছে, ঠিক তেমনিই ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার অধিকার সকলেরই আছে।" পদ্মপুরাণে এই কাহিনীতে বর্ণিত রাজা দিলীপ কোনও সাধারণ রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট। একবার তিনি উপযুক্ত পোশাকাদি পরে বনে গিয়েছিলেন শিকার করতে। শিকারের সমস্ত সরঞ্জাম, ধনুক, তরোয়াল, সাঙ্গপাঙ্গ, ঘোড়া ইত্যাদি নিয়ে তিনি যাত্রা করেন। ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ করাই ধর্ম। কিন্তু শান্তির সময়ে, যখন যুদ্ধ থাকে না, তখন বনে গিয়ে শিকার করার অনুমতি তাদের দেওয়াই আছে।

সেবার এক লোভনীয় জন্তুর পেছনে ধাওয়া করতে করতে রাজা দিলীপ গভীর অরণ্যে ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলেন। বহুক্ষণ ঘোরাঘুরি করতে করতে রাত ভোর হয়ে যায় এবং তৃষ্ণার্ত, শ্রান্ত হয়ে রাজা সুন্দর এক পদ্মদলশোভিত, পাখিদের গুঞ্জনমুখরিত বিশাল জলাশয়ের কাছে পৌছান। সেখানে সরিত মুনি ধ্যানমগ্ন ছিলেন। শীর্ণকায় তাঁর দেহ; তিনি নিরন্তর ভগবান বিষ্ণুর নাম কীর্তন করে চলেছিলেন। রাজা তাঁকে দর্শন করামাত্র শ্রদ্ধাভরে প্রণতি নিবেদন করেন। রাজাকে পরিশ্রান্ত দেহে ধুলিময় বস্ত্রাদিতে দেখে মুনি মন্তব্য করেন– এই পুণ্য মাঘ মাসের প্রাতে তুমি এখনও স্নান সম্পন্ন করনি! রাজা কৌতূহলবশত জানতে চান এমন আবশ্যকীয় স্নানের তাৎপর্য কি? এবং মুনির নির্দেশ অনুযায়ী রাজা বশিষ্ঠ মুনির কাছে যান পূর্ণাঙ্গ উত্তর পেতে। তিনি বলেন, বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ – এই তিন পুণ্য মাস অতিক্রান্ত হয়ে বসন্ত থেকে ক্রমে শীত ঋতু আগত হয়। পুণ্যপ্রার্থী এই সময়ে বহু পুণ্য লাভ করতে পারে, তার সমস্ত পাপ ধৌত হয়। তবে সমস্ত প্রক্রিয়াটাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে পালিত হওয়া উচিত।

হিমালয়ের মণিকুট পাহাড়ের ফল, ফুল, বনস্পতিসহ প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল শোভা বিলাসের মাঝে আবিষ্ট ভৃগু মুনির কাছে এক বিদ্যাধর-দম্পতি আসে। এবং কোনো কারণে তারা যে পারমার্থিক দিক দিয়ে উদ্বিগ্ন, তা প্রকাশ করে। ভৃগু মুনি বলেন, পুরো মাঘ মাসটা দিনে তিনবার স্নান করবে, বিশেষ করে সকালে। এভাবে, চাঁদ যেমন কমতে কমতে একাদশী দশা প্রাপ্ত হয় এবং বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণিমাতে ষোল কলা পূর্ণ হয়, তেমনি তোমার পাপ হ্রাস পাবে এবং পুণ্য বৃদ্ধি পাবে।

আরো একটি কাহিনী আছে যেখানে বর্ণিত হয়েছে চম্পক ফুলের দ্বারা পূজিত হলে বিষ্ণু কত খুশি হন। এক দুরাচারী রাজা ছিল, সে ছিল পাপী, শুচিক্রিয়া করত না, নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করত, বাছ বিচার বিহীনভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে মগ্ন হতো, লোক ঠকাতো, ঘুষ নিত – মোটের ওপর সে এক অযোগ্য শাসক ছিল। প্রজারা তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল, ফলে এক বিদ্রোহী দল গড়ে উঠল রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করবে বলে।

এই চারিত্রিক ইতিহাস যার, সেই রাজা একবার যায় তার এক

বাকি অংশ- ১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

আমি কিভাবে কৃষ্ণভক্ত হলাম

শাস্ত্রে কোথাও শিবকে পরমেশ্বর বলা হয় নি–পরমেশ্বর ভগবান একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। তখন তা বুঝতে পেরে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রই কেবল জপ করতাম এবং চারটি বিধিনিয়ম নিষ্ঠাভরেই মেনে চলতাম।

– শ্রীমদ্ ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বামী মহারাজ

১৯৬৯ সালে আমার কাছে একটা অভিনব আন্দোলনের খবর এলো–যে আন্দোলনে কোনো বন্দুকের নল নেই, গোলা-বারুদের গন্ধ নেই, অস্ত্রশস্ত্র, রাজনৈতিক ধান্দাবাজি নেই– আছে শুধু মাঙ্গলিক ঘন্টা, করতাল, মৃদঙ্গের ধ্বনি আর নৃত্য গীত সহকারে হরিনাম কীর্তন। যদিও এমন ব্যাপার কোনো দিন শুনি নি, তবু আধ্যাত্মিক উন্মেষের সন্ধানে আমার মনে কৌতূহল জাগল।

বছর দুয়েক পরে ১৯৭১ সালে লন্ডনের বার্মিংহামে ওয়াই-এম-সি-এ স্ট্রীটে শ্রীমদ্ সুভগ স্বামী মহারাজের আকস্মিক দর্শন পেলাম– তিনি রাস্তায় ইংরেজি 'ব্যাক্ টু গডহেড' পত্রিকা বিক্রি করছিলেন।

তখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সকালের সূর্যের মতো উজ্জ্বল কিরণ প্রসারিত করতে শুরু করেছে। সুভগ মহারাজের বিনয়ী বাচনভঙ্গী আমাকে মুগ্ধ করল। কিন্তু আমাকে একখানি 'ব্যাক্ টু গডহেড' ধরিয়ে দিয়ে পড়তে বললেন। আমার কাছে টাকাপয়সা ছিল না; আমি মহারাজকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কুড়ি পেন্স দিয়েছিলাম।

এরপর থেকে 'ব্যাক্ টু গডহেড' পত্রিকাটি কয়েকবার পড়লাম। ক্রমে ইসকনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়তে থাকলাম। খুব ভালোই লাগছিল। পত্রিকাটি আমাকে আকর্ষণ করতে পেরেছিল।

একদিন সুভগ মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রচারে যাবে?" প্রচার কি, কিভাবে কি করতে হয়, কাদের কি বলতে হয়, সেই সব আমি কিছুই জানতাম না। তাই ঐ প্রস্তাব শুনে ভয় পেয়েছিলাম। তবু মহারাজের সাথে যেতে হলো তাঁর অভিলাষ পূরণের কর্তব্যে। তিনি নিয়ে গেলেন বার্মিংহামের অস্টোন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

মহারাজের গৈরিক বসন থেকে যেন অদ্ভুত এক জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, যা সকলকে অবাক করে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত বিষয়ে ভাষণ দিলেন, কৃষ্ণগ্রন্থ বিতরণ করলেন, ছাত্রদের বিভিন্ন পারমার্থিক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করে দিলেন। এইভাবে আমার কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের নতুন অভিজ্ঞতা হলো, তাতে বাস্তবিকই ভারি আনন্দ পেলাম। আমার হৃদয়ে এক অনাস্বাদিত কর্তব্যবোধের শিহরণ জাগল।

কিন্তু তারপরে মাস দু-তিন আর যোগাযোগ রাখতে পারি নি। হঠাৎ একদিন ভরদুপুরে পথে মহারাজের সাথে আবার দেখা হয়ে গেল। আমি মহারাজকে আমার ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলাম। তাঁকে এক কাপ গরম দুধ খেতে দিলাম, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। গীতা থেকে একটি শ্লোক তুলে তিনি আমাকে বললেন–

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

(গীতা ৪ ৩/১৩)

অর্থাৎ, "ভগবদ্ভক্তেরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন, কারণ তাঁরা ভগবানকে নিবেদন করে অন্নাদি গ্রহণ করেন। যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য অন্ন পাক করে, তারা কেবল পাপ ভোজন করে।"

সেই আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা হলো। তখন থেকে আমি ইসকন সম্পর্কে আরও বিশদভাবে জানতে শুরু করলাম। মহারাজ আমাকে চারটি বিধিনিষেধ মেনে চলতে পরামর্শ দিলেন এবং আরও বেশি করে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পড়তে বললেন। বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে আমি সেইগুলি পড়তে লাগলাম – এই অতুলনীয় জীবনধারার যথার্থ রহস্য জানতে হবে।

ক্রমে বার্মিংহামের ইসকন মন্দিরে গিয়ে সুভগ মহারাজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে লাভ করতে থাকলাম। প্রায়ই মন্দিরের মণ্ডপ অনুষ্ঠানে যোগ দিতাম। মহারাজের জন্য হাট-বাজার করে দিতাম, সবজি কুটে দিতাম। মাঝে মাঝে বকুনিও খেতাম, তখন আনন্দই পেতাম তাঁর অন্তরঙ্গতায়। তিনি রান্না করে ভগবানকে সব কিছু ভোগ নিবেদন করতেন এবং তাঁর সঙ্গে আমি একসঙ্গে প্রসাদ পেয়ে ধন্য হতাম।

শ্রীমদ্ সুভগ স্বামী মহারাজ এমন সুন্দর আদর করে কৃষ্ণকথা শোনাতেন, জীবনে চলার পথের হদিশ দিতেন, যা চুম্বকের মতোই আমার সম্পূর্ণ সত্তাকে আকৃষ্ট করতে পারত–কৃষ্ণকথার গুণই এমন।

তিনি যখন কৃষ্ণগ্রন্থ থেকে পাঠ করে শোনাতেন, আমি মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক উত্থাপন করতাম এবং প্রায়ই বলতাম, "শ্রীকৃষ্ণ নয়, শিবই হচ্ছেন দেবাদিদেব পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর নামই জপ কীর্তন করা উচিত।"

কিন্তু মহারাজের সঙ্গে তর্কে পেরে উঠা মুশকিল ছিল– তিনি গীতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন– শাস্ত্রে কোথাও শিবকে পরমেশ্বর বলা হয় নি–পরমেশ্বর ভগবান একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ।–তখন তা বুঝতে পেরে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রই কেবল জপ করতাম এবং চারটি বিধিনিয়ম নিষ্ঠাভরেই মেনে চলতাম।

এরপর ১৯৭২ সালে জগৎপূজ্য পারমার্থিক বিপ্লবী সন্ন্যাসী শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত দর্শন লাভ করলাম—যাঁকে এতদিন গ্রন্থের মাধ্যমে জানতে চেষ্টা করতাম, অগাধ পাণ্ডিত্যের দুর্লভ অধিকারী সেই মহাত্মাকে স্বচক্ষে দেখবার পরম সৌভাগ্য আমার হলো। অবনতমস্তকে তাঁর চরণযুগলে আমার সসম্ভ্রম প্রণতি জ্ঞাপন করলাম। তিনি বললেন, "তুমি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ নিত্য আত্মা। শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কর– তুমি সেই ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে।"

এরপর জড় জগৎ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পালা। ১৯৭২ সালে লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে ইসকনের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করলাম। ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি তাঁর কাছে ব্রাহ্মণ দীক্ষাও অর্জন করি।

তিনি আমাকে সব সময়ে কৃষ্ণগ্রন্থ বিতরণের কথা বলতেন, "যদি আমাকে সন্তুষ্ট করতে চাও, তবে আমার গ্রন্থগুলি বিতরণ কর।" তাই করতাম আমি যথাসাধ্য।

১৯৮৩ সালে শ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ কৃপা করে আমাকে সন্ন্যাস আশ্রমের দীক্ষা প্রদান করে ধন্য করেছেন। আমি তখন মালয়েশিয়াতে সেবারত ছিলাম। মালয়েশিয়াতেই ১৯৩৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আমার জন্ম পেনাঙ শহরে। আমার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল সিংঘম্। বাবা বীরসিংহম্ ছিলেন এক ছাপাখানার মালিক, মা রোসমা। ১৯৭১ সালে আমি সিভিল ইনজিনীয়ারিং পড়া শেষ করে লন্ডনে যাই।

যখন পড়াশুনা করতাম, তখন আমার এক বন্ধু ছিল। সে ধ্যান ও যৌগিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে চর্চা করতে খুব ভালোবাসত। তার চিন্তাধারা প্রথমদিকে আমাকে প্রভাবিত করেছিল এবং দেবাদিদেব মহাদেবের ধ্যান করতে বৃথা চেষ্টা করতাম। পরে বুঝলাম, এভাবে হবে না। একটা প্রামাণ্য পথনির্দেশ দরকার। এক্সপেরিমেন্ট করে লাভ নেই। তখন থেকে আমি গুরুর খোঁজ করতাম।

এখন আমি সারা মালয়েশিয়া জুড়ে কৃষ্ণকথা প্রচার করি, নামহট্ট কর্মসূচির প্রসার করছি, বিদেশে এমন কি কলকাতাতেও নামহট্ট গঠন করেছি। ১৯৭৬ সালে বৃন্দাবনে ইসকন মন্দিরের টেম্পল্ কম্যান্ডারও ছিলাম।

১৯৯১-৯২ সালে আমি চারজন শিষ্য গ্রহণ করেছি, যাতে আমার প্রচারকার্যে তারা সহায়তা করতে শেখে।

[সাক্ষাৎকার–সুরেন্দ্রগৌরাঙ্গ দাস]

আলোচনা চক্র

সম্প্রতি ইস্কন জিবিসি অন্যতম আচার্য শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের সঙ্গে যুগান্তর পত্রিকার উপবার্তা সম্পাদক এবং প্রধান সহঃ সম্পাদক-এর সাথে ধর্ম আচরণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শাস্ত্র প্রমাণের মাধ্যমে শ্রীমদ ভক্তিচারু স্বামী ধর্মের যথার্থ উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করেছেন।

যুগান্তর : মহারাজ, কিছুদিন আগে আপনাদের আয়োজিত একটি সিম্পোসিয়ামে একজন বিখ্যাত বাঙালি সাহিত্যিক মন্তব্য করেছেন যে, ধর্ম হচ্ছে বড়লোকদের একটা ফ্যাসান। এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

ভক্তিচারু স্বামী : নেতৃস্থানীয় প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, জনসাধারণকে যথার্থ পথ প্রদর্শন করানো, কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম সম্বন্ধে এরকম একটা মন্তব্য সত্যিই বেদনাদায়ক। এইরকম সমস্ত মূর্খ লোকদের একদল বলছে–'ধর্ম বড়লোকদের ফ্যাসান', আরেকদল বলছে, 'ধর্ম' গরীবদের দুঃখ-দুর্দশা ভুলে থাকার এক প্রকার মাদকদ্রব্য।' যেহেতু তাদের ধর্ম সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই, তাই তাদের এই সমস্ত মন্তব্যগুলি সম্পূর্ণ অর্থহীন। ধর্ম-ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রতিটি জীবের পরম 'প্রয়োজন'।

ধর্ম কথাটির অর্থ হচ্ছে কোনো বস্তুর স্বাভাবিক বৃত্তি। যেমন, আগুন একটি বস্তু, এবং তাপ এবং আলোক হচ্ছে, তার স্বাভাবিক বৃত্তি। সুতরাং তাপ এবং আলোক হচ্ছে আগুনের ধর্ম। জল একটি বস্তু এবং তারল্য হচ্ছে তার স্বাভাবিক বৃত্তি। অতএব তারল্য হচ্ছে তার ধর্ম। তেমনই জীব হচ্ছে একটি বস্তু এবং তার স্বাভাবিক বৃত্তি হচ্ছে, ভগবানকে ভালোবাসা। সুতরাং ভগবানকে ভালোবাসাই জীবের ধর্ম। একটু বিচার করলেই দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মই মূলতঃ সেই ভগবানকে ভালোবাসার পন্থা প্রদর্শন করছে।

এই ধর্ম প্রতিটি জীবেরই বৃত্তি। এখানে বড়লোক, গরীব লোকের কোনো প্রশ্ন নেই। এমনকি এই ধর্ম কেবল প্রতিটি মানুষেরই নয়, তা প্রতিটি জীবের।

যুগান্তর : প্রতিটি জীবের ধর্ম মানে কি, গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ সকলেরই ধর্ম? তা যদি হয়, তাহলে তাদের ধর্ম আচরণের ধরণটি কেমন? সত্যি কথা বলতে কি, একটা কুকুর বা একটা বিড়ালকে ঘণ্টা নেড়ে ভগবানের পূজো করার কথা অথবা মসজিদে কলমা পড়ার কথা কল্পনাও করা যায় না।

ভক্তিচারু স্বামী : আমি আগেই বলেছি যে, ধর্ম কথাটির অর্থ হলো 'ভগবানকে ভালোবাসার পন্থা'। তা কতকগুলি অনুষ্ঠান বা আচরণই কেবল নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, ভালোবাসার প্রবণতা প্রতিটি জীবের মধ্যে রয়েছে। আপনার পোষা কুকুরটি আপনাকে ভালোবাসে। এমনকি একটা বাঘ বা সিংহের মতো হিংস্র প্রাণীকেও তাদের শাবকদের ভালোবাসতে দেখা যায়। তা থেকে বোঝা যায় যে, প্রতিটি প্রাণীরই ভালোবাসার প্রবণতা রয়েছে। তবে জড়জগতে এই প্রবণতাটি বিকৃত হয়ে গিয়েছে। এই জড়জগতে প্রতিটি জীবই ভগবানকে ভালোবাসার পরিবর্তে
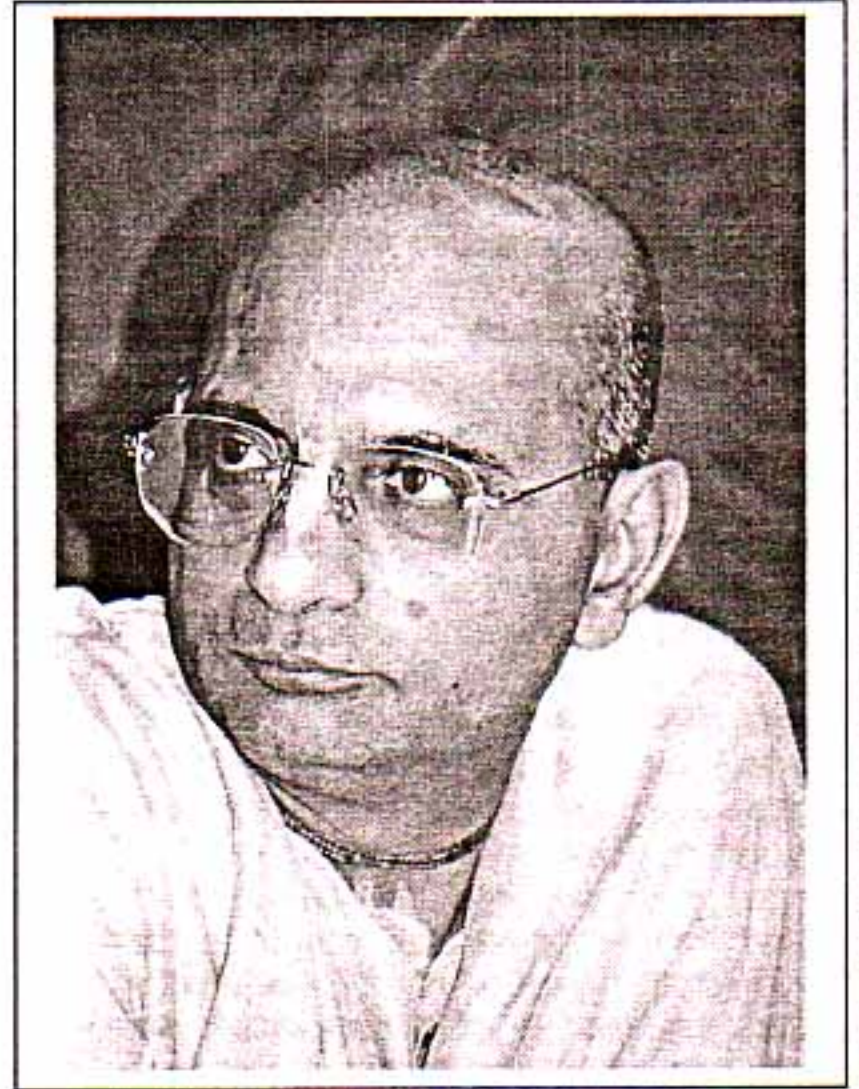
অন্য কোনোকিছুকে ভালোবাসছে।

যুগান্তর : হ্যাঁ, সেটা তাদের স্নেহ মমতার প্রকাশ। তাদের পক্ষে সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু যে ভগবান সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তাদের নেই, এবং কোনোদিন হয়ত হবেও না তাঁকে তারা ভালোবাসবে কি করে?

ভক্তিচারু স্বামী : ভগবানকে তারা যে কোনোদিনও জানতে পারবে না, এই অনুমানটি ঠিক নয়। কেননা প্রতিটি জীবই তার স্বরূপে চেতন আত্মা। দেহটি আত্মার আবরণ মাত্র। সেই আত্মা হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ। অংশ হওয়ার ফলে ভগবানের সঙ্গে জীবাত্মার নিত্য সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু জীব যখন ভগবানের প্রতি বিমুখ হয়, তখন তার চেতনা আচ্ছাদিত হয়, এবং সে ভগবানের কথা ভুলে যায় এবং এই জড় জগতে পতিত হয়ে বিভিন্ন জড় দেহ ধারণ করে। সেই দেহটিকেই তার স্বরূপ বলে ভুল করে। সে সম্বন্ধে প্রেমবিবর্ত গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–

কৃষ্ণ-বহির্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে।।
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব-উদয়।।

'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস'– এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হইয়া চিরদিন বুলে।।
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শুদ্র।
কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট ক্ষুদ্র।।
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু।।

বিভিন্ন ধরনের জড় দেহ হচ্ছে, জীবাত্মাকে জড় জগতে বেঁধে রাখার জন্য জড়া-প্রকৃতির আয়োজন। কিন্তু জীব-ভগবানের সঙ্গে যখন তার নিত্য সম্পর্কে অধিষ্ঠিত হয়, তখন বন্ধনমুক্ত হয়ে সে ভগবানের কাছে ফিরে যায়।

যুগান্তর : পশুরাও কী তা পারে?

ভক্তিচারু স্বামী : জীবের ভববন্ধন মোচন হয় ভগবানের কৃপার প্রভাবে, পশুরাও এমনকি পশুর থেকে নিম্নস্তরের জীবেরাও ভগবৎ-প্রেমের অমৃত আস্বাদন করে চিজ্জগতে ফিরে যেতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন ঝাড়িখণ্ডে বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন বনের হিংস্র পশুরাও তাঁর কৃপায় হরিনাম কীর্তন করে প্রেমানন্দে ঊর্দ্ধবাহু হয়ে নৃত্য করেছিল। মহাপ্রভুর ভক্ত শিবানন্দ সেনের সঙ্গে একটি কুকুর জগন্নাথ-পুরীতে মহাপ্রভুর কাছে এসেছিল। মহাপ্রভু তাকে তাঁর উচ্ছিষ্ট নারকেলের নাড়ু দেন এবং তা খেয়ে কুকুরটির আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ হয় এবং সে হরিনাম কীর্তন করতে থাকে। এরকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

যুগান্তর : তার মানে কী কুকুরটি মানুষের মতো কথা বলছিল?

ভক্তিচারু স্বামী : শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে সেই কথাই লেখা আছে। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কথা যে বলে সে তো আত্মা। কণ্ঠ, জিহ্বা, ওষ্ঠ ইত্যাদির মাধ্যমে তার প্রকাশ হয় মাত্র। যেমন, একটা মৃত দেহ জিহ্বা, ওষ্ঠ ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও কথা বলতে পারে না। আবার আমরা যখন স্বপ্ন দেখি, তখন স্বপ্নে আমরা কথা বলি বা শুনি, কিন্তু তখন জিহ্বা বা কর্ণ কোনো ইন্দ্রিয় কাজ করে না। এইভাবে বোঝা যায় যে, আত্মার চেতনা বিকশিত হলে, পশুও মানুষের মতো কথা বলতে পারে।

এই তত্ত্বটি বুঝতে হলে, চেতনার বিকাশ কিভাবে হয় তা জানতে হবে। চেতনা হচ্ছে আত্মার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আত্মা যখন জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়, চেতনা তখন আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। জড় আবরণ যত বেশী হয় তত আচ্ছাদিত হয়। এই আচ্ছাদন অনুসারে জীব বিভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়। গাছপালার চেতনা এত বেশী আচ্ছাদিত যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন তাদের চেতনাই নেই। কিন্তু মানুষের চেতনাকে পূর্ণরূপে বিকশিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। জীব যত ভগবৎমুখী হয় তার চেতনাও তত বিকশিত হয়। কেন না ভগবান হচ্ছেন চেতনার উৎস। প্রকৃতিতে কর্ম অনুসারে জীব বিভিন্ন ধরনের দেহ প্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের চেতনা লাভ করে, কিন্তু সে যখন ভগবানকে ভালোবাসার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তখন তার চেতনা পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। বাইরে তার আবরণটি যাই হোক না কেন, অন্তরে সে তখন পূর্ণ চেতনার বিকাশজনিত দিব্য আনন্দ অনুভব করে। সেটিই হচ্ছে ভগবৎ প্রেমের পরম প্রাপ্তি।

যুগান্তর : সুতরাং ভগবানকে ভালোবাসার অধিকার প্রতিটি প্রাণীরই রয়েছে।

ভক্তিচারু স্বামী : হ্যাঁ, অধিকার প্রতিটি জীবেরই রয়েছে, এবং সেটিই হচ্ছে জীবের ধর্ম। ধর্ম কোনো মনগড়া মতবাদ নয়–তা বাস্তব সত্য এবং তা প্রতিটি জীবের পরম প্রয়োজন। যেমন, আমাদের নিঃশ্বাস নেওয়া একটা প্রয়োজন। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু মানুষ নানারকম মতবাদ তৈরি করতে পারে। কিন্তু সেই মতবাদগুলি দিয়ে আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। আমি নিজে যতক্ষণ বুক ভরে শ্বাস গ্রহণ না করতে পারছি ততক্ষণ আমার স্বস্তি হয় না– বেশীক্ষণ শ্বাস নিতে না পারলে যন্ত্রণায় আমি ছটফট করি। তেমনই, ভগবানকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসা আমাদের পরম প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত ভগবানকে ভালোবাসতে না পারলে আমাদের জীবন দুঃখময় হয়ে ওঠে; কিন্তু যখন আমরা ভগবানকে ভালোবাসতে শুরু করি তখনই কেবল আমরা আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত 'আনন্দ' লাভ করতে পারি। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম।

যুগান্তর : আপনি যেভাবে বোঝালেন, তাতে ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত সংশয় দূর হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি ধর্ম সম্বন্ধে এমন উদার বিশ্লেষণ আমি এর আগে কখনো শুনি নি।

ভক্তিচারু স্বামী : সে কৃতিত্ব আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের। তাঁরই কৃপায় এই তত্ত্বটি আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি এবং আপনাদের বোঝাতে পেরেছি।

যুগান্তর : ধর্মকে 'বড়লোকের ফ্যাসান' বলে যে সাহিত্যিক মহোদয় মন্তব্য করেছিলেন সে সম্বন্ধে আপনি কী কিছু বলবেন?

ভক্তিচারু স্বামী : কোনো কিছু সম্বন্ধে বলার আগে সেই বিষয়টি সম্বন্ধে জানতে হয়। তা না হলে অনধিকার চর্চা হয়ে যায়। যেমন, আমি যদি ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু না জেনে ইতিহাস সম্বন্ধে মন্তব্য করতে শুরু করি, তাহলে কি সেটা সমীচীন হবে? তেমনই 'ধর্ম' কি, তা আগে জানুন, তারপর সে সম্বন্ধে মন্তব্য করুন। তা না হলে নিজে বিভ্রান্ত হবেন এবং আর পাঁচজনকেও বিভ্রান্ত করবেন। **অন্ধ যথা অন্ধৈরূপনীয়মানাদ্**– অন্ধ যদি আর কয়েকটা অন্ধকে পথ দেখাতে যায়, তাহলে কি হবে? সকলেই অন্ধকূপে পতিত হবে। আজকাল তাই হচ্ছে, কতকগুলি অন্ধ নেতা সেজেছে। আর তার ফলে সমাজের যে কি অবস্থা হয়েছে তা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করুন এবং সুখী হউন।

সাধু ও ভক্তের কিছু গুণাবলী

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ শ্রীধাম মায়াপুর-চন্দ্রোদয় মন্দির প্রাঙ্গণে প্রদত্ত ভাগবত প্রবচন থেকে সংকলিত

— শ্রীমদ্ ত্রিবিক্রম স্বামী মহারাজ

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ভুক্ত ২১তম শ্লোকে সাধুর গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। কোনও সাধুর সঙ্গ পেলে সেটা অবশ্যই আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যজনক।

জীব কত প্রকার বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে চলেছে। কোনও অজ্ঞাত সুকৃতির ফলে ভগবানের ভক্তের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার আমাদের করতে হবে। আমরা সাক্ষাৎ পেয়েছি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের মতো সাধুসজ্জন তথা মহাজনের।

আমি যেহেতু খুব গর্বিত ও উদ্ধত স্বভাবের ছিলাম, আমি তাঁকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে নিতে চেয়েছিলাম, ভাবতাম – এই লোকটি কিভাবে সর্বজনপূজ্য হচ্ছেন? তাঁর প্রতি বিদ্বেষ জন্মেছিল আমার মনে। কারণ পাশ্চাত্যে আমরা ভাবি, সামান্য একজন মানুষকে কিভাবে পূজা করা যায়! অথচ লোকে তাই করছে। আবার তারা মান্যগণ্য লোকও বটে। তবে নিজেই দেখা যাক, কেন তারা এটা করছে।

অতএব আমি আমার অমার্জিত পদ্ধতিতেই শ্রীল প্রভুপাদকে যাচাই করতে গেলাম। আমি যখন তাঁকে পরীক্ষা করছিলাম, তিনিও আমাকে পরীক্ষা করে নিচ্ছিলেন। তবুও তিনি আমাকে তাঁর কাছে আসার সুযোগ দিয়ে চলেছিলেন। তাঁর একটা গুণ যেটা আমাকে বিস্মিত করেছিল, তা হল তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন, প্রেরণা জাগাতেন এবং সহনশীল ছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ যে কোনও জনকেই ভক্তিসেবা চর্চার সুযোগ দিতেন – দায়িত্বভার নিতে, ভোরে শয্যা ত্যাগ করতে, কিন্তু পরীক্ষাটা ছিল– চালিয়ে যেতে পারবে তো, প্রমাণ করতে পারবে যে, তুমি একজন ভক্ত? তা হলে আমরা খোলা মনে দু'হাত বাড়িয়ে সকলকেই সাদর আমন্ত্রণ জানাতে পারি– হরেকৃষ্ণ জপ কীর্তন কর এবং এটিই ছিল শ্রীল প্রভুপাদের পদ্ধতি।

সকলকেই স্বাগত জানানো আছে– কিন্তু এই ধারাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের নিষ্ঠাবান হতে হবে। 'ভক্ত' মানে– আমি স্বীকার করছি যে, এমন ব্যক্তি আছেন যিনি আমার থেকে বেশি জানেন। অর্থাৎ যাঁরা শাস্ত্রের অনুশাসন গ্রহণ করেছেন।

আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে নিজেদের হৃদয়ের মধ্যে। কারণ কলিযুগে অসুরগুলো আমাদের ভেতরেই বাস করছে। আমরা যদি আত্মনিবেদিত না হই, তবে কি করে উন্নতি করব? তখন আমরা অপরাধ করে ফেলি।

কিভাবে এই সামঞ্জস্য আনা যায়? – নিজেরাই নিজেদের বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে এবং যখন আমরা অন্যদের বিশ্লেষণ করব, তখন। প্রকৃত দীনতা চাই। সন্তোষ ছাড়া এই মনোভাব আসে না। আবার নিজেকে বিশ্লেষণ না করলে আমরা অন্যের দোষ খুঁজতে থাকি।

মহাভারতের কাহিনীতে একবার গুরু দ্রোণাচার্য তাঁর শিষ্যবর্গ কৌরব ও পাণ্ডবদের কিছু শেখাচ্ছিলেন। তিনি দুর্যোধনকে বললেন, সারা পৃথিবী থেকে একজন সৎ মানুষ খুঁজে আনো। যুধিষ্ঠিরকে ডেকে বললেন, তুমি একজন বাজে লোককে খুঁজে আনো।

কিছু সময় পরে তারা যার যার উত্তর নিয়ে ফিরল। দুর্যোধন জানাল, 'আমি সর্বত্র খুঁজেছি, সকলেরই কিছু না কিছু দোষ রয়েছে– এটাই তো স্বাভাবিক।' যুধিষ্ঠির জানাল, 'আমি কোনও বাজে লোক খুঁজে পাচ্ছি না, সকলেই তো ভাল, তাই নয় কি?'

সুতরাং দ্রোণাচার্য বললেন, 'যুধিষ্ঠির, তোমার খোঁজার ইতি আমি করে দিলাম– এই নাও দুর্যোধনকে। আর দুর্যোধন, এই নাও– যুধিষ্ঠিরকে পেলেই তোমার খোঁজার শেষ হবে।'

অতএব ভক্তরা কখনো দোষ খোঁজে না। এই হবে তাদের মনোবৃত্তি। অবশ্য তারা সেই তিন বাঁদরের মতো হয় না।– 'মন্দ জিনিস দেখতে নেই, মন্দ কথা শুনতে নেই, মন্দ কথা বলতে নেই।' কারণ প্রচার করতে গেলে সমালোচনা করতে নিশ্চয় হয়। তবে যদি আমরা শাস্ত্রগুরুকে (প্রামাণ্য অনুশাসন সূত্রকে) সমালোচনা করি, তবে আমাদের ভিত হবে খুবই নড়বড়ে।

আবার সামঞ্জস্য অবশ্যই থাকা দরকার। প্রচার ক্ষেত্রে সকলকেই এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে– ক্রুশবিদ্ধ না হয়েও কিভাবে প্রচার চালানো যায়। কখনও কখনও খ্রিস্টানরা যেচে কৃচ্ছ্রতা ঘাড়ে নিতে পছন্দ করে। ঐ সবের প্রয়োজন হয় না। এই রকম ভক্তরা শান্তিপ্রিয় প্রকৃতির হয়, কারণ তারা জানে কিভাবে নিজেদের সঙ্গে এবং অপরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়। মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে সেই ভক্তরা হয় সহনশীল–(তরোরিব সহিষ্ণুনা)।

একবার একজন শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আপনারা এই সংস্থার নাম দিয়েছেন 'আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ'– কিন্তু এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আসছেন কি ভাবে?" তার উত্তরে এক ভক্ত বলেছিল, "শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বুদ্ধি দেবেন আর আমরা সেই বুদ্ধি অনুসারে কাজ করব।" শ্রীল প্রভুপাদ তখন বাধা দিয়ে বলেছিলেন, "না, শ্রীকৃষ্ণ সরাসরিই আমাদের সাথে কথা বলবেন। প্রতি মুহূর্তেই তিনি আমাদের সাথে কথা বলছেন। নিজেকে প্রকাশ করছেন।"

সাধু হবার সঠিক উপায় হলো সাধুর সঙ্গ করা। যাঁরা অনেক উন্নতি করেছেন, তাঁদের অনুসরণ করা উচিত। কেউ কেউ বলে, আমি এতই পতিত যে মহাপ্রভুর কৃপার যোগ্য আমি নই, ইত্যাদি। কিন্তু তুমি কি পতিতই থেকে যাবে? অতি বিনয়ী হলে চলবে না। জানতে হবে আমাদের গুরুদেব কি করলে সন্তুষ্ট হবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ খুব খুশি হন যদি আমরা গ্রন্থ বিতরণ করি, মন্দির প্রতিষ্ঠা করি, নতুন ভক্ত করি, প্রসাদ বিতরণ করি।

সাধারণভাবে প্রভুপাদ ছিলেন খুবই আত্মনিবেদিত। একবার এক প্রাতঃভ্রমণের সময়ে প্রভুপাদ বললেন, 'আজ একটা অনুষ্ঠান করা যায়। তবে প্রথমে মন্দির অধ্যক্ষের কাছে আমাদের অনুমতি নিতে হবে।' তিনি মজা করছিলেন না– তাঁর মনোবৃত্তিই এমন ছিল যে, আগে কর্তৃপক্ষের সাথে বোঝাপড়া করে নেওয়া দরকার।

পূর্বাশ্রমে প্রভুপাদ যে কোম্পানীতে কাজ করতেন; সেখানে অন্য কেউ আন্দোলন, ধর্মঘট করলে তিনি তা ব্যর্থ করে দিতেন। আমি যেটা বলতে চাইছি তা হলো আন্দোলনের স্বার্থে আন্দোলন করাটা প্রভুপাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

এক কথায় আন্দোলন তিনি অবশ্যই করেছিলেন, তবে তা ছিল বিপথগামী সমগ্র সভ্যতার বিরুদ্ধে। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন তাঁর গুরুভাইদের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর গুরুমহারাজের আদেশ পালন করতে। আলাদা একটি আন্দোলন গড়তে বা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে তিনি চাননি। প্রভুপাদ বলেছেন, আমরা যেন পরস্পরের সহযোগিতায় মিলেমিশে কাজ করি।

বানপ্রস্থ জীবনে শান্তিলাভের পন্থা

২৫ মার্চ ১৯৯৪ শ্রীধাম মায়াপুরে চন্দ্রোদয় মন্দির-কক্ষে প্রদত্ত ভাগবত প্রবচন

— শ্রীমৎ শিবরাম স্বামী

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে পরম ভগবদ্ভক্ত মহাভাগবত জড় ভরত বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে এই জড় জগতে জড় জীবের যে কী অবস্থা. তার বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন শ্লোকে বিভিন্নভাবে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে হয়ত মনে হতে পারে, এই শ্লোকটি বিশেষ করে আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আবার অন্য একটি শ্লোক পড়লে মনে হবে, সেটিও আমার জন্য। বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে জড় জগতে বদ্ধ জীবের দুঃখকষ্টের বর্ণনা দেওয়া আছে।

এছাড়াও ভাগবতে আমরা ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের কাহিনীর মাধ্যমে দেখেছি, জড় জগতে জীবের দুঃখকষ্টের নানা দৃষ্টান্ত এবং কিভাবে তার মাঝে নিরুদ্বিগ্ন হয়ে থাকতে হয়।

যখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তার পুত্র প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তুমি গুরুর কাছে কি ভাল জিনিস শিখেছ, আমাকে বল। তুমি তো অনেক জ্ঞান লাভ করেছ, তা শুনি।" হিরণ্যকশিপু ভেবেছিল, তার পুত্র রাজবংশের পণ্ডিতদের কাছে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে, তাই সে নিশ্চয়ই রাজ্যের রাজনৈতিক উন্নতি, অর্থনৈতিক উন্নতি কিভাবে হবে, জীব কিভাবে শান্তি পাবে, এই সব কথা প্রহ্লাদের মুখে শুনবে।

কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ কি বলেছিলেন? তিনি বললেন, এই সব পরিত্যাগ করতে হবে। এই সমস্ত যে গৃহকূপ, এই গৃহরূপী অন্ধকূপ পরিত্যাগ করলে তবেই জীবনে আনন্দ পাবে।

গৃহ পরিত্যাগ করে মানুষ কি করবে? প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছিলেন, জঙ্গলে যাবে। সেখানে গিয়ে কি করবে?— সেখানে শ্রীহরির আশ্রয় নেবে।

এই সব কথা শুনে হিরণ্যকশিপুর ভাল লাগে নি। হিরণ্যকশিপুর মতো জড়জাগতিক মানুষদের কাছে এই সব কথা ভাল লাগে না।

কিন্তু যাদের যথার্থ সম্বন্ধ জ্ঞান আছে, তারা জানে, এই জড় জগতে জীবের অবস্থাটা কেমন। এই জড় জগতের মধ্যে বাস করেও এর স্বরূপ আমরা বুঝতে পারব কেমন করে? বুঝতে পারব সাধুসঙ্গের মাধ্যমে। জড় জগতে জীব কেমন ভাবে কি কারণে দুঃখ পাচ্ছে, তা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, যথার্থ সাধুজনের সঙ্গলাভ করতে পারলে।

জড় জগতে বাস করার ফলে নিত্য নানা রকমের দুঃখকষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও আমরা মনে করছি–কতই না সুখে আছি আমরা! এটা হচ্ছে আমাদের অজ্ঞানতার ফলে।

কিন্তু সাধুসঙ্গের মাধ্যমে সেই অজ্ঞানতা দূর হয়ে যায়। তখন আমরা বুঝতে পারি, আমাদের দুঃখকষ্টের বাস্তবিক কারণটা কি।

যথার্থ বাস্তব জিনিসটা কী? সকলেই এই জড় জগতের সংসার-মধ্যে সুখী হতে চায়। তার জন্য পরিশ্রম করতেও চায়। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা- ভাষ্যে তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট বৈষ্ণব মহাজন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা অনুসরণ করে লিখেছেন, কেউ যখন একটা পাহাড়ে উঠতে চায়, তা হলে সে কি করবে? প্রথমে পাহাড়টির উচ্চতা জানতে চাইবে, কতটা কষ্ট করতে হবে, তার অনুমান করে নেবে। পাহাড়ে উঠতে গেলে অনেক কাঁটা থাকে, অনেক ছোটখাটো পাথর কাঁকর থাকে। যখন সেগুলির ওপর দিয়ে চলতে হয়, তখন অনেক কষ্ট পেতেই হয়।

তাই পাহাড়ে ওঠার যে আনন্দ, যে সুখ, তা পেতে হলে ঐ সব কাঁটা আর পাথরগুলো আমাদের দুঃখ দেয়। তেমনই এই জড় জগতে সুখী হতে গেলে অনেক কষ্ট করে জাগতিক কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করতে হবে।

শেষে হয়ত দেখা যাবে, সেই সব কর্তব্যকর্মই আমাদের হৃদয়বিদারক দুঃখ প্রদান করছে। দেখা যায় বাস্তবিকই, জড় জগতে পরিবার পরিজনের মধ্যে যাদের আমরা বিশেষ ভালবাসি, তারা আমাদের শত্রু হয়ে উঠল। এমন কতই না কর্তব্যকর্ম আমাদের করে চলতে হয়, যার বিনিময়ে কোন ধন্যবাদ জোটে না। কত ভাল জিনিস কত খেটে তৈরি করি, কত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তারপর সেটিকে সংরক্ষণ করে রাখার জন্য কত চিন্তা ভাবনা করতে হয়, কত রকমের অসুবিধার সুরাহা করতে হয়। কিন্তু পরিণামে ফল লাভ হয় হৃদয়বিদারক। যার জন্যে কর্তব্য সাধন করা হল, হয়ত সে-ই পরিত্যাগ করে চলে গেল।

এই জগতে তো প্রায়ই এমন ব্যাপার ঘটতে দেখা যাচ্ছে। স্বেচ্ছায় বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কতই না বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। জগতে এমন হাজার হাজার দৃষ্টান্ত দেখছি। এক সময়ে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন ছিল, কিন্তু ক'দিনের মধ্যেই সব ভেঙে গেছে।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই সম্পর্কে ভাগবতের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, যদি কোনও না কোনও সময়ে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিবারবর্গের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই হয়, তা হলে কেন আমরা সময় থাকতে বৈদিক সভ্যতার পরিকল্পনা অনুসারে বিচ্ছিন্ন হতে উদ্যোগী হব না?

এই সম্পর্কে একটি সুন্দর জীবন পদ্ধতি বৈদিক বর্ণাশ্রম রীতির মধ্যে রয়েছে। এই বর্ণাশ্রম রীতি অনুসারে ৫০ বছর বয়স হলেই স্ত্রীকে পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করে বনে গমন করতে হয় ভগবানের ভজনা করার উদ্দেশ্য। যদি কেউ স্বেচ্ছায় বর্ণাশ্রম রীতি অনুসারে গৃহ-পরিবার স্ত্রী-পরিজন পরিত্যাগ করে বনে গমন না করতে চায়, তা হলে একদিন না একদিন তাকে বাধ্য হয়ে অকস্মাৎ সব ফেলে রেখে চলে যেতেই হবে। কালের প্রভাবে আমাদের স্ত্রী চলে যাবে, ধনসম্পদ পরিবার সবই চলে যাবে। একদিন আমাদের সর্বহারা হয়ে যেতে হবে।

ভাগবতে এমন কথাও বলা হয়েছে যে, কলিযুগে দেশের সরকারই এমন উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থাদি প্রচলন প্রবর্তন করতে থাকবে যে, লোকে সুস্থির হয়ে জনবসতির মাঝে থাকতে পারবে না, শহর ছেড়ে বনে নির্জনে চলে যেতেই ইচ্ছা হবে। তাই ভাগবত ভাষ্যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, মানুষ যেন সময় থাকতে সব কিছু পরিত্যাগ করে ভগবৎ ভজনার সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বনে নির্জনে বানপ্রস্থ জীবনধারায় চলে যাওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি অর্জন করতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, জীবন সায়াহ্নে আমরা সব কিছু পরিত্যাগ করে কোন্ বনে যাব?– বৃন্দাবনে। তীর্থস্থানে। যেখানে জড় জগতের জটিলতা কুটিলতা নেই, শঠতা প্রবঞ্চনা নেই, আছে কেবল নিরন্তর ভগবৎ ভজনার অফুরন্ত সুযোগ সুবিধা। সেখানে জীবনের সমস্ত দুঃখকষ্ট থেকে অবশ্যই মুক্তি পাওয়া যায়।

শ্রীবৃন্দাবনধাম শ্রীকৃষ্ণের সমান, শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণের মতোই পূজ্য সেই শ্রীধাম বৃন্দাবন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, সেখানে যাও, শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ কর। আজকের যুগে বানপ্রস্থ জীবনে মানুষ বনে জঙ্গলে গিয়ে ভগবৎ-ভজনা করতে পারবে না, তেমন সুযোগ সুবিধা নেই। তাই, বৃন্দাবনই এই যুগের বানপ্রস্থীদের শ্রেষ্ঠ বিরাম স্থল। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের উদ্যোগে, যাতে ভগবদ্ভক্তজন সেখানে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে বসবাস করতে পারেন। এই রকম তীর্থে বসবাস করলে শান্তিতে আধ্যাত্মিক বাতাবরণে বানপ্রস্থ জীবন-যাপন করা সম্ভব হয় এবং এইভাবে ভগবৎ চিন্তার মাধ্যমে সুনিশ্চিতভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে।

এই জড় জগতে বর্তমান পরিস্থিতিতে সুখী হয়ে থাকবার জন্য যত রকমের চেষ্টাই করা হোক না কেন, তা সবই ব্যর্থ হচ্ছে। তা আমরা নিত্য নিয়তই লক্ষ্য করছি। তাই আমাদের কি করতে হবে?– কৃষ্ণভাবনাময় পরিবেশে কোনও জায়গায় শান্তিতে থাকতে হবে। দেখা যাচ্ছে, পরিণত বয়সে যারা এই জড়জাগতিক জীবনধারায় ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ছে, তারা অনেকেই বৃন্দাবনে গিয়ে বসবাস করতে চাইছে–সেখানকার পরিবেশ খুব শান্ত।

বৃন্দাবনধামেও যাওয়া চলে, আবার শ্রীধাম মায়াপুরেও যাওয়া যায়। শ্রীমায়াপুরে বানপ্রস্থ জীবন-যাপনের পরিকল্পনা করলেও শেষ জীবনে দিব্য আনন্দ লাভ করা যেতে পারে। কারণ এই শ্রীমায়াপুর ধামেরও অশেষ মহিমা আছে, জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে এই পবিত্রভূমির। এখানে শ্রীশ্রীরাধামাধবের শ্রীচরণাশ্রয়ে বানপ্রস্থ জীবন-যাপনের পরিকল্পনা করলে আধ্যাত্মিক জীবনে সুনিশ্চিতভাবেই অনেক উন্নতি করা সম্ভব হবে। কারণ এই শ্রীধাম মায়াপুরও এক দিব্য ধাম।

এইভাবেই সমস্যার যথার্থ সমাধান করতে হবে। ভাগবতে পরম ভগবদ্ভক্ত জড় ভরত এই ধরনেরই পরামর্শ দিয়েছিলেন রহুগণ মহারাজকে। জড়জাগতিক জীবনধারা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়ে উঠলে জীবনের সায়াহ্নকালে বানপ্রস্থ আশ্রমে এমন ধরনের দিব্যধামেই বসবাসের আয়োজন করে নিতে বলা হয়েছে।

শ্রীনবদ্বীপধাম তথা শ্রীমায়াপুরধাম সবই শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকে অভিন্ন। তেমনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে শ্রীগোবিন্দ অভিন্ন। তাই এই ধরনের তীর্থস্থানে বানপ্রস্থ জীবন যাপন করে ভগবানের নাম কীর্তনের মাধ্যমে জীবনকে শান্তিময় করে তোলা সম্ভব হবে। আগেকার যুগের মতো পাহাড়ে জঙ্গলে গিয়ে কাঁটা কাঁকড় পাথর পেরিয়ে কষ্ট ভোগ করতে হবে না। অনায়াসে শান্তিতে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে।

পুন্য সংগ্রহের মাস- ৮ পৃষ্ঠার পর

বেশ্যা-বান্ধবীর সাথে দেখা করতে। মহিলাটি তার বাগানে এক চম্পক গাছের নিচে সুন্দর করে সাজানো বসার জায়গায় অপেক্ষা করেছিল। কোনোভাবে বিদ্রোহীরা এই সংবাদ পায় এবং তারা এই বাগানবাড়িটি ঘিরে ফেলে এবং সুযোগের ওৎ পেতে থাকে।

রাজা যখন গল্প করছিল, গাছ থেকে একটি চম্পক ফুল ঝরে পড়ে। এবং সেই মুহূর্তে রাজা বলে ওঠে "মুরারি পুষ্পক নারায়ণায় নমঃ"। ঠিক যেমন একটা গল্পে আছে – এক ফেরিওয়ালা ঝুড়িতে করে খই নিয়ে যাচ্ছিল। এক দমকা হাওয়ায় সব খই উড়ে যায়। খইগুলো যখন বাতাসে রয়েছে, লোকটি চেঁচিয়ে বলে নিল, "উড়ো খই গোবিন্দায় নমো"। অর্থাৎ মাটিতে যতক্ষণ না পড়ছে ততক্ষণ অবধি তা শুদ্ধ আছে, বিক্রির লাভ যখন হলোই না, শুদ্ধ থাকতে থাকতে গোবিন্দকে নিবেদনে লাভটুকু পেয়ে নেওয়া যাক। যখন সেটা কোনো কাজেই লাগছে না, তখন আমরা তা কৃষ্ণকে দিয়ে দিই। 'কিছু না'-এর থেকে তা-ই ভালো।

তো, রাজা যেইমাত্র বলেছে, 'নারায়ণ, এই ফুলটি তোমার উদ্দেশ্যে দিলাম', ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্রোহীরা শোঁ করে একটা তীর ছুঁড়ল এবং তা গিয়ে বিঁধল সোজা রাজার বুকে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যুকোলে ঢলে পড়ল রাজা। যমদূতেরা তাকে নিতে এল, কারণ সে ছিল পুরোপুরি অধার্মিক পাপাচারী নরাধম। বিষ্ণুদূতেরাও এল, তারা বলল, 'ঠিক কথা, কিন্তু মৃত্যুকালে ওর শেষ কথা ছিল বিষ্ণুর নাম। এই পুণ্য মাঘ মাসে সে বিষ্ণুকে একটি পুষ্প অর্পণ করেছে এবং বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করে দেহ ত্যাগ করেছে।' যমদূতেরা প্রতিবাদ করে বলল, 'ও তো নিষ্ঠার সাথে কিছু করে নি।'

বিষ্ণুদূতেরা সেই কথায় কর্ণপাত না করে রাজার আত্মাকে নিয়ে বৈকুণ্ঠে, বিষ্ণুলোকে চলে গেল। সেখানে ভগবান বিষ্ণু দু'বাহু প্রসারিত করে, 'আমার প্রিয় ভক্ত,এস', বলে রাজাকে অভিনন্দন জানালেন। রাজা ভাবছে, 'আমি? ভক্ত?' বিনয়ের সাথে বলল, 'আমি এত শুদ্ধ হতে পারলাম কই?' বিষ্ণু বললেন, না, না, তুমি আমায় আমার প্রিয় চম্পক ফুল অর্পণ করেছ। পুণ্য মাঘ মাসে যে এই কাজ করে, আমার কাছে আসার পথ তার কাছে অতি সহজ হয়ে যায়। তারপর মৃত্যুকালে তোমার মুখের শেষ কথা ছিল আমারই নাম। অন্তিম মুহূর্তে যে আমার নাম নিতে পারে সেও আমাকেই প্রাপ্ত হয়।'

রাজা বুঝল, ভগবান বড়ই করুণাময়। যদিও আমি যোগ্য নই, তবু সুযোগ তো একটা পেয়েছি। এই ভেবে সে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল। হৃদয়ে সে এক পরিপূর্ণ পরিবর্তন অনুভব করল। ফলে ভগবান তাকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন এবং সে সম্পূর্ণ শুদ্ধতা অর্জন করল।

সুতরাং এই মাঘ মাসে সামান্য একটা ফুল নিবেদনেরও কত বিশাল পাওনা থাকে। তাই এটি একটি বিশেষ মাস।

তবে ভক্তরা নিত্যের খদ্দের। তারা সব মাসেই ভগবানের কৃপা লাভ করে থাকে। অতএব এটি হল নবাগতদের আকৃষ্ট করার একটি পন্থা। প্রকৃতপক্ষে, ভক্তরা সব রকম আচার-অনুষ্ঠানই সব মাসে করে থাকে– এবং তারা তা করে শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

সদ্‌গুরু ও অসদ্‌গুরুর বিচার-বিশ্লেষণ

– মুরারিগুপ্ত দাস ব্রহ্মচারী

যিনি জীবনের পরম লক্ষ্যে পৌঁছতে চান, তার একজন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন। এই পথপ্রদর্শকই হচ্ছেন সদ্‌গুরু। জড়-জাগতিক দিক দিয়েও দেখতে পাই, লেখাপড়া, খেলাধুলা, গানবাজনা বা অন্যান্য বিষয়ে সাফল্য লাভ করতে হলে একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। এই জন্য যে ব্যক্তি যে বিষয়ে সাফল্য অর্জন করতে চায়, তাকে সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হয়।

কেউ বলতে পারে না–'আমার নিজের একক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমি সালফ্য অর্জন করব।' সেটি ঠিক নয়–যেমন, পড়াশুনায় কৃতিত্ব অর্জন করতে গেলে, একজন অভিজ্ঞ শিক্ষককে গুরুরূপে বরণ করতে হয়। গানে সাফল্য অর্জন করতে গেলে, একজন অভিজ্ঞ গানের শিক্ষককে গুরুরূপে বরণ করতে হয়। ভাল ফুটবল খেলোয়াড় হতে গেলে, একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ কোচকে গুরুরূপে বরণ করতে হয়।

তেমনই, আমি কে, ভগবান কে, আমি এই জড় জগতে কেন আবদ্ধ হয়ে পড়েছি, বৈকুণ্ঠ জগৎ কোথায় এবং কি করে সেই চিন্ময় জগতে ফিরে যাওয়া যায় ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে গেলে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে সাফল্য অর্জন করতে গেলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত একজন মহাভাগবত বৈষ্ণবকে অবশ্যই গুরুরূপে বরণ করতে হবে।

জড়-জাগতিক তথাকথিত শিক্ষক ও গুরুদেব সাহায্যে এই জড় জগতে আমরা যা কিছু লাভ করি, তা সবই ক্ষণভঙ্গুর। মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্–"ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্বগ্রাসী মৃত্যু।" যখন কারও মৃত্যু হয়, তখন কিছুই তার সঙ্গে যায় না। তার গাড়ি, বাড়ি, ধনদৌলত, ভূসম্পত্তি, এমন কি প্রিয় স্বজনবর্গ তাকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করে।

তাই, তথাকথিত পার্থিব গুরু-প্রদত্ত যে কৃপা তা জলের বুদ্‌বুদের মতো ক্ষণস্থায়ী। তথাকথিত অনেক গুরুদের দেখা যায়, তারা ছাই থেকে সন্দেশ বানিয়ে তার চেলাচামুণ্ডাদের মোহিত করে। আবার অনেক যোগীদের দেখা যায়, তারা জলের উপর হাঁটতে পারে। এগুলি জড়-জাগতিক সিদ্ধি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তিরা এদের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন, এই সব চমকদারি গুরুরা প্রবঞ্চক ছাড়া আর কিছু নয়। একটু ম্যাজিক শিখেই বা একটু যোগসিদ্ধি লাভ করেই তারা গুরু হয়ে যায়। একটি সন্দেশ বানাবার জন্য বা একদলা সোনা বানাবার জন্য তপস্যা করার কি দরকার? মিষ্টির দোকানে গেলেই সন্দেশ পাওয়া যায়। তেমনই, জলে হেঁটে পার হওয়ার কি প্রয়োজন? নৌকার মাধ্যমেই আমরা জলের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারি। এগুলি শুধু সময়ের অপচয় ও লোক-ঠকানো ছাড়া আর কিছু নয়।

আজকাল গেরুয়া বসনধারী লম্বা দাড়িওয়ালা তথাকথিত ভণ্ড সাধুদের দেখা যায়, যারা চব্বিশ ঘণ্টা গাঁজা খেয়ে চুর হয়ে থাকে, সেই সঙ্গে তারা আধ্যাত্মিক বুলিও আওড়ায়। এই সমস্ত ব্যক্তিরা সদাচারীও তত্ত্ববেত্তা নয়। এরা তমোগুণের দাসত্ব করে, তাই এরা মোটেই গুরুপদবাচ্য নয়।

আজকাল তথাকথিত বহু সহজিয়া গুরুদের দেখা যায়, যারা নিজেদের ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী বৈষ্ণব বলে পরিচয় দিয়ে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ পালন করে না। তারা দেহতত্ত্ব নিয়ে নানা রকমের মনগড়া ব্যাখ্যা পরিবেশন করে, কিন্তু চিন্ময় আত্মা ও পরমাত্মা নিয়ে আলোচনা করে না।

এই সমস্ত সহজিয়া অপসম্প্রদায়ের গুরুরা কৃষ্ণনাম কীর্তন করলেও, যেহেতু সদাচারী নয়, তাই তাদের কীর্তন শ্রবণ করার ফলে জনসাধারণের হৃদয় শোধন হয় না। সদাচার বলতে বুঝায়–আমিষ আহার, নেশা, জুয়াখেলা ও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করা। এই সমস্ত তথাকথিত গুরুরা শিষ্য বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে তাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়ার আশায়। তারা নিজেরাই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং চা, পান, বিড়ি ইত্যাদি নেশায় আসক্ত। এরা নিজেরাই মুক্ত নয়, তাই শিষ্যদেরও মুক্ত করতে পারে না।

শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য অধিকাংশ ব্যক্তিরা বিভিন্ন অপসম্প্রদায়ের গুরুদের দ্বারা বঞ্চিত হচ্ছে। এই সব অপসম্প্রদায়গুলি হচ্ছে–আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়ানেড়ি, সাঁই, দরবেশ, সখিভেকি, স্মার্ত, জাতগোঁসাই, সহজিয়া, অতিবাড়ি, গৌরাঙ্গনাগরী ও চূড়াধারী। মহান বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সমস্ত অপসম্প্রদায়ের সঙ্গ থেকে শুদ্ধ ভক্তি অনুশীলনকারীদের দূরে থাকতেই বলেছেন।

সৎসম্প্রদায়ের গুরু গ্রহণ না করলে তিনি বৈষ্ণব হতে পারেন না। অতএব তিনি গুরু হবেন কি করে? সম্প্রদায়বিহীন গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করলে, সেই মন্ত্র ফলদায়ক হয় না। সেই সম্পর্কে পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে–

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
শ্রী-ব্রহ্মা-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥

"সম্প্রদায় স্বীকৃত আচার্যগণের উপদিষ্ট মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্রসমূহ ফলপ্রদ হয় না। শ্রী-সম্প্রদায়, ব্রহ্ম-সম্প্রদায়, রুদ্র-সম্প্রদায় ও চতুঃসন-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ জগৎপাবন।"

শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও চতুঃসন–এই চারটি সম্প্রদায়ের ধারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে এই জড় জগতে নেমে এসেছে। শ্রী-সম্প্রদায়ের আচার্য হচ্ছেন রামানুজাচার্য, ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের আচার্য হচ্ছেন মধ্বাচার্য, রুদ্র সম্প্রদায়ের আচার্য হচ্ছেন বিষ্ণুস্বামী এবং চতুঃসন সম্প্রদায়ের আচার্য হচ্ছেন নিম্বাকাচার্য। এই সমস্ত মহান আচার্যগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্বে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে সমস্ত কু-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে প্রচার করেছিলেন।

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপরোক্ত চারটি সম্প্রদায়কে স্বীকার করেছেন। এই চারটি বৈধ সম্প্রদায়ের বাইরে যে সমস্ত মনগড়া সম্প্রদায় নিজেদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী বলে পরিচয় দেয়, সেগুলো সবই অপসম্প্রদায়ভুক্ত। যেমন, যে সমস্ত বৈদ্যুতিক বাল্বগুলি পাওয়ার হাউসের সঙ্গে যুক্ত নয়, সেই সমস্ত বাল্বগুলি আলোকদান করে না; যারা বৈধ সম্প্রদায়ের গুরুর কাছ থেকে দীক্ষার মাধ্যমে 'হরিনাম মহামন্ত্র' গ্রহণ করেনি, তাদের মন্ত্রও ফলপ্রসূ হবে না। অতএব গুরুগ্রহণের ব্যাপারে প্রত্যেকের সাবধান হওয়া উচিত যে, সেই গুরু বৈধ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কি না।

সৎসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব না হলে তার মুখ থেকে হরিনাম ও কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা উচিত নয়। সেই সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে—

অবৈষ্ণবমুখোদগীর্ণং পুতং হরিকথামৃতম।
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

"সম্প্রদায়বিহীন অবৈষ্ণবের মুখে পবিত্র হরিকথামৃত শ্রবণ করা উচিত নয়, তা সর্পোচ্ছিষ্ট দুধের মতো ক্ষতিকারক।"

দুগ্ধ অতি পবিত্র বস্তু। সেই দুধ সেবন করলে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। কিন্তু ঐরূপ উৎকৃষ্ট দুধ সর্পের উচ্ছিষ্ট হলে যেমন তা দুধের ক্রিয়া না করে বিষেরই ক্রিয়া করে থাকে, সেই রকম শুদ্ধ বৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত পবিত্র হরিকথা শ্রবণে জীবের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হয়, কিন্তু নামাপরাধী অবৈষ্ণব ব্যক্তির মুখোদগীর্ণ উপদেশাদি বাহ্য আকারে হরিকথার মতো 'মনে হলেও তা নামাপরাধ মাত্র' এই প্রকার নামাপরাধ শ্রবণ করা কখনও উচিত নয়। তার ফলে জীবের মঙ্গল হওয়া তো দূরের কথা, সর্পোচ্ছিষ্টের মতো অমঙ্গলই হয়ে থাকে।

আজকাল গ্রামে-গঞ্জে জাঁকজমকের সঙ্গে অষ্টপ্রহর কীর্তনের আসর বসে। সেখানে যারা কীর্তন পরিবেশন করে, তারা অধিকাংশই বিভিন্ন অপসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। যদিও তারা বাদ্যযন্ত্রাদি সহযোগে সুন্দর সুরের লহরীর মাধ্যমে কীর্তন পরিবেশন করে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু তাদের সত্যিকারের কোন মঙ্গল হয় না।

এই সব অপসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা অর্থের বিনিময়ে কীর্তন পরিবেশন করে থাকে। তা ছাড়া এরা সদাচারী নয়। কীর্তনের সময় এরা কৃত্রিমভাবে কৃষ্ণপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার প্রদর্শন করে থাকে, কিন্তু কীর্তন শেষে এরা ধূমপান, আমিষাহার ও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে লিপ্ত হয়। তাই এদের দ্বারা জগতের কোন কল্যাণ হতে পারে না।

তেমনই, বর্তমান কালে এক শ্রেণীর ভাগবত পাঠকদের দেখা যায়, যারা অর্থের বিনিময়ে ভাগবত ব্যাখ্যা করে। এরা প্রথম থেকে ভাগবত ব্যাখ্যা না করে এক লাফে দশম স্কন্ধের রাসলীলা ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করে। দশম স্কন্ধের রাসলীলা হচ্ছে লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মাধুর্য রসের ভক্ত গোপিকাদের অন্তরঙ্গ লীলাবিলাস। ভগবানের এই অন্তরঙ্গ লীলাবিলাস মহাভাগবত ভক্তদেরই একমাত্র আস্বাদনের বিষয় কিন্তু অযোগ্য সহজিয়া বা পেশাধারী ভাগবত পাঠকেরা ভগবানের গুহ্যতম লীলাবিলাস সাধারণ শ্রোতাদের কাছে পরিবেশন করে মহা অপরাধ করে থাকে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত, বিশেষ করে সদগুরুর কাছ থেকে শ্রবণ করতে হয়। সদ্গুরুর কৃপায় শিষ্য কৃষ্ণকথা শ্রবণের যোগ্যতা লাভ করেন। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি সদগুরুর অন্বেষণ করে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন। এই সম্বন্ধে ভগবদগীতায় (৪/৩৪) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

"সদগুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্রচিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর। তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।"

জীবনের পরম লক্ষ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য সমগ্র বেদশাস্ত্রই সদগুরুর শরণাগত হবার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সম্বন্ধে মুণ্ডক উপনিষদে (১/২/১২) বলা হয়েছে—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম॥

"সেই ভগবৎ-বস্তুর বিজ্ঞান প্রেমভক্তির সঙ্গে জ্ঞানলাভ করার জন্য তিনি সমিধ হস্তে অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ নিয়ে বেদতাৎপর্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদগুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করবেন।"

এই জগতে সদগুরু লাভ করা খুবই দুর্লভ। শাস্ত্রপ্রমাণ ও লক্ষণের দ্বারা সদগুরুকে চেনা যায়। সদগুরুর লক্ষণ সম্পর্কে শাস্ত্রে ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিত যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

"যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জন দ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করেন, সেই গুরুদেবকে প্রণতি নিবেদন করি।"

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥

"যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই 'গুরু', তা তিনি ব্রাহ্মণ হন, সন্ন্যাসী হন, অথবা শূদ্রই হন না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮/১২৮)

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম॥

"কর্তব্যাকর্তব্য জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তম ও শ্রেয় অবগত হবার জন্য সদগুরুকে আশ্রয় করবেন। যিনি 'শব্দব্রহ্মে' অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্র সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ অধোক্ষ অনুভূতি লাভ করেছেন এবং সেই জন্য যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নন, তিনিই সদগুরু।" *(ভাগবত ১১/৩/২১)*

সদগুরুর কর্তব্য নয় শিষ্যকে জড়-জাগতিক ব্রহ্ম লাভের জন্য আশীর্বাদ প্রদান করে তাকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখা। বরং সদগুরুর কর্তব্য শিষ্যকে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করা, যাতে সে জড় জগতের অনিত্য বিষয়মোহ থেকে অনাসক্ত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষভদেব তাঁর শত পুত্রদের উপদেশ দিয়েছেন, গুরুর্ন স স্যাৎ— "যিনি তাঁর আশ্রিত জনকে আসন্ন জন্ম-মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে না পারেন, তিনি যথার্থ গুরু নন।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় একজন সদগুরু লাভ করেন এবং সদগুরুর কৃপায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়। বহু জন্ম-জন্মান্তরের ভাগ্যের ফলে একজন সদগুরুর কাছ থেকে দীক্ষার মাধ্যমে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র লাভ করেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (মধ্য ১৯/৫১) বলা হয়েছে—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

"জীব তার কর্ম অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে। কখনও সে উচ্চতর লোকে উন্নীত হয় এবং কখনও নিম্নতর লোকে অধঃপতিত হয়। এইভাবে ভ্রমণরত অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কোন একটি জীব তার অসীম সৌভাগ্যের ফলে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সদগুরুর সান্নিধ্য লাভ করে। এইভাবে গুরু ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের কৃপার প্রভাবে জীব ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হয়।"

গুরুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দাস হলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের করুণার প্রকাশ-বিগ্রহ। বদ্ধ জীব গুরুদেবের কৃপা ছাড়া সরাসরি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করতে পারে না। গুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের করুণার প্রকাশ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী গুরুতত্ত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

"শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। গুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের কৃপাপূর্বক উদ্ধার করেন।"

(চৈঃ চঃ আদি ১/৪৫)

আচার্য মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥

"আচার্যকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে অভিন্ন বলে মনে করা উচিত এবং কখনও কোনও ভাবে তাঁকে অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়। তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়, কেন না তাঁর মধ্যে সমস্ত দেবতার অধিষ্ঠান আছে।" *(চৈঃ চঃ আদি ১/৪৬)*

সদগুরু প্রাকৃত জাতিকুলের অতীত তত্ত্ব। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেও যদি তিনি বৈষ্ণব না হন, তবে তিনি গুরু হতে পারেন না, কিন্তু চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করেও যদি তিনি বৈষ্ণব হন, তা হলে তিনি সদগুরু হতে পারেন এবং তখন তিনি ব্রাহ্মণেরও গুরু। এই সম্পর্কে হরিভক্তিবিলাসে উল্লেখ আছে–

ষট্ কর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥

"যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ–এই ছয় প্রকার কর্মে নিপুণ ও মন্ত্রতন্ত্রে বিশারদ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণও গুরু হতে পারেন না, কিন্তু চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করেও বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ বৈষ্ণব গুরু হবার যোগ্য।"

যিনি গুরুদেবের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন অর্থাৎ যিনি আদর্শ শিষ্য, তিনিই গুরু হবার যোগ্য। সমগ্র শাস্ত্রেই অসদগুরুকে ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। অনেককে দেখা যায় অপসম্প্রদায়ের অসদগুরু গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাকে ত্যাগ করছেন না। তাদের বলতে শোনা যায় যে, একবার গুরু গ্রহণ করলে তাকে ত্যাগ করা যায় না। সদগুরুর ক্ষেত্রে এই কথাটি নিঃসন্দেহে সত্য, কিন্তু অসদগুরুকে ত্যাগ না করলে গুরু-শিষ্য উভয়কে নরকগামী হতে হয়।

শুধু অসদগুরুই পরিত্যাজ্য নয়, এমন কি সদগুরু যিনি প্রথমে সদাচারী, নিষ্ঠাবান ও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তিনি কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে ভগবদ্ভক্তি থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, এই প্রকার গুরুকেও পরিত্যাগ করতে শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সম্পর্কে মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে (১৭৯/২৫) লিপিবদ্ধ আছে–

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

"ভোগ্যবিষয়ে লিপ্ত, কি করা কর্তব্য ও কি করা অকর্তব্য সেই বিষয়ে বিচারহীন, মূঢ় ও শুদ্ধ ভক্তি ব্যতীত ইতর পন্থানুগামী ব্যক্তি নামে মাত্র গুরু হলেও তাকে পরিত্যাগ করাই বিধি। সদগুরুর চরণাশ্রয় ছাড়া জীবের কোন রকম মঙ্গল হতে পারে না। কেউ যদি জন্ম-মৃত্যুময় ভব-সংসারের অপর পার বৈকুণ্ঠ জগতে ফিরে যেতে চায়, তাকে অবশ্যই বৈষ্ণব সদগুরুর চরণাশ্রয় করে তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁকে গুরুরূপে বরণ করতে হবে। সেই সম্পর্কে হরিভক্তিবিলাসে (২/১০) বলা হয়েছে–

অতো গুরুং প্রণম্যৈবং সর্বস্বং বিনিবেদ্য চ।
গৃহ্নীয়াদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্বং বিধানতঃ॥

"অতএব প্রত্যেকের কর্তব্য–দেহ, মন ও বুদ্ধি সহ সদগুরুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর কাছ থেকে বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করা।"

দীক্ষা কাকে বলে? সেই সম্পর্কে বিষ্ণুযামল-বাক্যে বলা হয়েছে–

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম।
অস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

"যেহেতু দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা) সমূলে বিনাশ করে থাকে, সেই জন্য ভগবৎ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে দীক্ষা নামে অভিহিত করেন।"

যে ব্যক্তি সদগুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না, তাকে এই জড় জগতে চৌরাশি লক্ষ যোনিতে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বারংবার পরিভ্রমণ করতে হয়। সেই সম্বন্ধে বিষ্ণুযামলে উল্লেখ আছে–

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্বং নিরর্থকম।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরোহিতো জনঃ॥

"দীক্ষাহীন ব্যক্তির দ্বারা কৃত সব কিছুই অর্থহীন। যেহেতু সেই ব্যক্তি সদগুরুর শরণাপন্ন হয়ে দীক্ষাগ্রহণ করে নি, তাই তাকে পশুযোনি লাভ করতে হবে।"

সদগুরুর কৃপায় অপরাধমুক্ত হয়ে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ ও কীর্তন করলে, আমরা অচিরেই নামপ্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারব। আসুন, আমরা সকলে মিলে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করি–

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

সম্পাদকীয়–৪০ পৃষ্ঠার পর

এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, বিভিন্ন দেব-দেবীরা যদি ভগবানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হন, তা হলে তাদের পূজা করার মাধ্যমেও একই উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া উচিত। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, দেব-দেবীর উপাসকেরা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, তাই তারা জানে না দেহের কোন অংশে খাদ্য দিতে হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এত বোকা যে, তারা দাবি করে, ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্নভাবে খাবার দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেউ কি কান দিয়ে কিংবা চোখ দিয়ে দেহকে খাওয়াতে পারে? তারা জানে না যে, বিভিন্ন দেব-দেবীরা ভগবানের বিশ্বরূপের এক-একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তাদের এই অজ্ঞতার ফলে তারা মনে করে যে, ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীরা হচ্ছেন, এক-একজন ভগবান এবং তাঁরা সকলেই স্বয়ং ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী।

দেব-দেবীরাই কেবল ভগবানের অংশ নন, সাধারণ জীবেরাও ভগবানেরই অংশ বিশেষ। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণেরা হচ্ছে ভগবানের মস্তক, ক্ষত্রিয়েরা হচ্ছে ভগবানের বাহু, বৈশ্যেরা তাঁর উদর এবং শুদ্রেরা হচ্ছে তাঁর পদ এবং তারা সকলেই এক-একটি বিশেষ কর্তব্য সম্পাদন করছে। মানুষ যে স্তরেই থাক না কেন, যদি সে বুঝতে পারে যে, দেব-দেবীরা এবং সে নিজে ভগবানের অংশবিশেষ, তা হলে তার জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আর এটা না বুঝতে পেরে সে যদি কোন বিশেষ দেবতার পূজা করে, তা হলে সেই দেবলোকে সে গমন করে। ভগবদ্ভক্তের গন্তব্যস্থল আর এদের গন্তব্যস্থল এক নয়।

দেব-দেবীদের তুষ্ট করার ফলে যে বর লাভ হয়, তা ক্ষণস্থায়ী, কারণ এই জড় জগতে সব কিছুই অনিত্য–সেই সমস্ত দেব-দেবীরা, তাঁদের ধাম এবং তাঁদের অনুচর– এই সব কিছুই অনিত্য। তাই এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, দেব-দেবীর পূজা করে যে ফল লাভ হয়, তা ক্ষণস্থায়ী এবং অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরাই কেবল এই সমস্ত দেব-দেবীর পূজা করে থাকে। ভগবানের শুদ্ধ-ভক্ত কিন্তু ভগবানের সেবা করার ফলে সচ্চিদানন্দময় জীবন প্রাপ্ত হন। তিনি যা প্রাপ্ত হন, তা দেবোপাসকদের প্রাপ্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরমেশ্বর ভগবান অসীম, তাঁর অনুগ্রহ অসীম, তাঁর করুণাও অসীম। তাই তাঁর শুদ্ধ ভক্তের উপর তাঁর যে করুণা বর্ষিত হয়, তা অসীম।

একাদশী তত্ত্ব : একটি গবেষণামূলক বিশ্লেষণ

– শ্রী মনোরঞ্জন দে

পূর্ব প্রকাশের পর

উদাহরণ ঃ (২) ইস্‌কন কর্তৃক প্রকাশিত "ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে" পত্রিকাটির মার্চ ২০০৬ইং সংখ্যা দেখুন। এতে ২০০৬ সালের একাদশী ব্রতের তালিকা দেয়া আছে। ৩০/১২/২০০৬ইং শনিবার পুত্রদা একাদশী। ২৯/১২/২০০৬ইং শুক্রবার রাত্রি ৩/১৯/৪৯ সেঃ পর্যন্ত দশমী আছে। এর পরে একাদশী আরম্ভ। শনিবার প্রাতে ৬/৫১/২৪ সেঃ গতে সূর্যোদয়। এখন ৬/৫১/২৪ সেঃ থেকে চারদন্ড সময় অর্থাৎ ১ ঘন্টা ৩৬ মিঃ বাদ দিলে পাওয়া যায় ৫/১৫/২৪ সেঃ একাদশী এই সময়ের পূর্বেই প্রবৃত্তি অর্থাৎ আরম্ভ হয়। তাই এটি দশমী বিদ্ধা একাদশী নয়।

উদাহরণ ঃ (৩) স্মার্ত মতে দশমী বিদ্ধা হলেও একাদশী হবে। অথচ গৌড়ীয় সম্প্রদায় মতে কোনক্রমেই দশমী বিদ্ধা একাদশী হবে না। লোকনাথ পঞ্জিকা ১৪১৩ সালের ১৩ই এপ্রিল ২০০৭ইং দেখুন। এদিন একাদশী নির্ধারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে নিম্বার্ক মতে পরাহে। অর্থাৎ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবরা পরের দিন অর্থাৎ ১৪ই এপ্রিল শনিবার দ্বাদশী দিনে একাদশী ব্রত করবেন (এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে) কিন্তু আগের দিন অর্থাৎ ১২ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার শেষরাত্র ৪/২৭/৫৪ সেঃ পর্যন্ত দশমী আছে। পরের দিন ১৩ই এপ্রিল শুক্রবার সূর্যোদয় হবে ৫/৫২/৪৯ সেঃ গতে। এখন এই সময় থেকে ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বাদ দিলে পাওয়া যায় বৃহস্পতিবার শেষরাত্রি ৪/১৬/৪৯ সেঃ অথচ একাদশী আরম্ভ হবে এই দিন রাত্র ৪/২৭/৫৪ সেঃ গতে। সুতরাং একাদশী ৪/১৬/৪৯ সেঃ এর পূর্বে নয় বরং পরে আরম্ভ হয়েছে। তাই এটি হবে দশমী বিদ্ধা একাদশী। কাজেই গৌড়ীয় সম্প্রাদায়ের শুক্রবার ১৩ই এপ্রিল নয় বরং শনিবার একাদশী করবেন। এখানে একটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়। কোন কোন সময় দেখা যায় ইস্‌কন কর্তৃক একাদশী ব্রতের চার্টের সাথে গৌড়ীয় কর্তৃক প্রকাশিত চার্ট একরকম নয়। দুই একটি একাদশী ব্রতের দিন পৃথক হয়। নীচে একটি উদাহরণ দেয়া হল।

ইস্‌কন-এর "ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে" পত্রিকার মার্চ ২০০৬ইং সংখ্যায় দেয়া একদাশী ব্রতের চার্টটি লক্ষ্য করুণ। ঐ চার্টে ২১/৬/২০০৬ইং বুধবার যোগীনি একাদশী এর কথা লেখা আছে। অথচ গৌড়ীয় মঠের চার্ট অনুযায়ী একই একাদশী পর দিন ২২/৬/২০০৬ইং বৃহস্পতিবার হবে বলা হয়েছে। তাহলে এই পার্থক্য কেন? আবার লোকনাথ পঞ্জিকা ১৪১৩ বাংলা দেখুন। এই পঞ্জিকার ২১-৬-২০০৬ইং তারিখ বুধবার স্মার্ত মতে একাদশী উপবাসের কথা লিখিত আছে। বলা হয়েছে গোস্বামী এবং নিম্বার্ক মতে পরাহে নিম্বার্ক এই দুইমত অনুযায়ী ২২/৬/২০০৬ইং বৃহস্পতিবার একাদশী হবে। গোস্বামীমত বলতে স্মার্ত পণ্ডিতরা কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রাদয়ের মত বুঝিয়েছেন।

এখন ২০/৬/২০০৬ইং মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রি ৩/৫৫/৪ সেঃ পর্যন্ত দশমী ছিল। পরদিন ২১/৬/২০০৬ইং বুধবার প্রাতে সূর্য্যোদয় ৫/২৪/১৮ সেঃ গতে হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে সূর্য্যোদয়ের থেকে ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বিয়োগ করলে পাওয়া যায় মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রি ৩/৪৮/১৮সেঃ একাদশী এই সময়ের পূর্বে কিন্তু আরম্ভ হয় নাই। একাদশী আরম্ভ হয়ে মঙ্গলবার রাত্রি ৩/৫৫/৪ সেঃ গতে মাত্র ৭ মিনিট হেতু এই একাদশী দশমী বিদ্ধা হয়েছিল। এজন্য পঞ্জিকার উল্লেখিত সময় গণনা যদি সঠিক হয় তবে গৌড়ীয় মতে বুধবার না হয়ে বৃহস্পতিবার একাদশী হওয়া উচিত। গৌড়ীয় মঠের সিদ্ধান্ত তাই পঞ্জিকার সময় অনুসারে সঠিক ছিল। তবে স্মার্ত্ত পঞ্জিকার সময়ভিত্তিক ৭ মিনিটের হেরফের সঠিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। কারণ সময় সম্পর্কে গৌড়ীয় মঠ এবং ইসকন এর ক্যালকুলেশন এর কিছুটা হেরফের হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। বিশেষত উভয় প্রতিষ্ঠানের একাদশী চার্ট মূলতঃ মায়াপুর থেকে আসে। বাংলাদেশে যে পঞ্জিকাগুলি রয়েছে সে তালিকার মূলভিত্তি পশ্চিমবঙ্গের স্মার্ত্ত পন্ডিতদের সময়-গণনা ভিত্তিক। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্জিকার সময় এর সাথে আধঘন্টা যোগ করে বাংলাদেশে পঞ্জিকাগুলির সময়মান নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র। সুতরাং উৎসে গণনায় ৭ মিনিটের হেরফের হওয়া বিচিত্র নয়। তাই গৌড়ীয় মঠের বৃহস্পতিবার একাদশী করে যেমন খুব একটা ভুল হয় নাই, তেমনি ইস্‌কন বুধবার একদশী করায় কোন মারাত্মক ভুল করে নাই। এজন্য ৩/৫ মিনিট হেরফের দশমী বিদ্ধা মনে হলে যার যার সময় পরিমাণ অনুযায়ী একাদশী করলে সেটি খুব দোষের কিছু হবে না বলে মনে হয়। তাই এই নিয়ে ফ্যাসাদ এবং তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত না হওয়াই ভাল বলে মনে করি। পরিশেষে বলা যায় শ্রীহরিভক্তি বিলাস (১২/৩২৯) অনুযায়ী সূর্যোদয়ের ৩২/১ দন্ড একাদশী থাকলে দশমী সহ ঐ একাদশী বেধ হয়। এই হিসাবে কিন্তু আবার ইস্‌কন নির্ধারিত তারিখ সঠিক বলা যায়। মোহিনী বেধের ফল গ্রহণ করে বলে এতে ব্রত উপবাস নিষিদ্ধ রয়েছে। আবার শাস্ত্রে বলা আছে দশমী বিদ্ধা একাদশী করলে জম্ভাসুর সেই ফল ভোগ করে। এসব কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা দশমী বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করেন।

(খ) নিম্বার্ক সম্প্রাদায়ের মত ঃ শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ কপাল বিদ্ধা একাদশী বর্জন করেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১২/৩৫৭) গ্রন্থে লিখিত আছে অর্ধরাত্রির পরে যদি দশমী কিঞ্চিৎ অনুবৃত্তি (অর্থাৎ থাকে) তবে তৎপরবর্তী একাদশীর সাথে এর কপালবেধ হয়। অর্থাৎ নিম্বার্কীয় মতে কপাল বিদ্ধা একাদশীও ত্যাজ্য। অর্থাৎ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবরা এমনিতেই দশমী বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করেন। তাদের সপক্ষে কূর্ম্মপুরাণের নিম্নের বচনটি রয়েছেঃ

অর্দ্ধরাত্রমতিক্রম্য দশমী যদি দৃশ্যতে
তদা হ্যেকাদশীং ত্যক্তা দ্বাদশীং সমূপোষয়েৎ।

অর্থাৎ যদি অর্দ্ধরাত্রির পর দশমী দৃষ্ট হয় তাহলে একাদশী পরিত্যাগ পূর্বক দ্বাদশীতে উপবাস করা বিধেয়, এখন অর্ধ্বরাত্রির পর বললে রাত্রি ১২টা অতিক্রম করা বুঝায়। তাই দশমী যদি পূর্ব দিন রাত্রি ১২টার পরও থাকে তবে পরদিন নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবরা একাদশী না করে দ্বাদশী দিনে একাদশী ব্রত করেন। নীচে দুটি উদাহরণ দেয়া হলঃ

উদাহরণ ঃ (১) লোকনাথ পঞ্জিকা ১৪১৩ বাংলা এর পৃষ্ঠা ১৯১ দেখুন। ১৫/১০/২০০৬ইং তারিখ সোমবার রাত্রি ১২/৩৬/২৭ সেঃ পর্যন্ত দশমী। পরে একাদশী আরম্ভ হয়ে পরদিন অর্থাৎ ১৭/১০/২০০৬ইং মঙ্গলবার রাত্রি ২/৮/১৭ সেঃ পর্যন্ত। পরে দ্বাদশী। নিম্বার্ক মতে দশমী সোমবার অর্ধরাত্রি অতিক্রম করায় পরের দিন মঙ্গলবার একাদশী পরিত্যাগ করে বুধবার দ্বাদশীতে হবে। কারণ একাদশী অর্ধ্বরাত্রি বিদ্ধা হয়েছে। অথচ দশমী বিদ্ধা না হওয়ায় গৌড়ীয় মতে একাদশী মঙ্গলবারই হবে।

উদাহরণ ঃ (২) একই পঞ্জিকার ৩২৩ পৃষ্ঠা দেখুন। ১২/২/২০০৭ইং তারিখে সোমবার রাত্রি ২/৫৫/১১ সেঃ পর্যন্ত দশমী আছে। পরে একাদশী আরম্ভ হয়ে ১৩/২/২০০৭ইং তারিখে মঙ্গলবার ৩/৩/৫৩ সেঃ পর্যন্ত থাকবে। এক্ষেত্রে এই একাদশীটি দশমী বিদ্ধা নয়। কিন্তু অর্ধ্বরাত্রি বিদ্ধা বলে নিম্বার্কমতে দ্বাদশী দিনে অর্থাৎ ১৪/২/২০০৭ইং তারিখে একাদশী করতে হবে।

(গ) একাদশী দিন নির্ধারণ ঃ গৌড়ীয় বনাম নিম্বার্কমতঃ নিম্বার্ক মতে একাদশীর পূর্ব দিন দশমী রাত্রি ১২টা অতিক্রম করলেই পরের দিনের একাদশী কপাল বিদ্ধা অথবা অর্ধ্বরাত্রি বিদ্ধা বলে পরিগণিত হবে। তাই ঐ একাদশী পরিত্যাজ্য। দ্বাদশীতে একাদশী ব্রত করতে হবে।

গৌড়ীয় মতে অর্ধ্বরাত্রি বিদ্ধা হলেই হবে না। তা এমনভাবে হতে হবে যাতে একাদশী দশমী বিদ্ধা হয়। তাহলেই একাদশী ব্রত দ্বাদশী দিনে করতে হবে। এজন্য কোন একাদশী দশমী বিদ্ধা হলে সেটি এমনিতেই অর্ধ্বরাত্রি অথবা কপাল বিদ্ধা হয়ে যায়। তাই বলা যায় দশমী বিদ্ধা একাদশী অবশ্যই কপালবিদ্ধা হয়। কিন্তু কপাল বিদ্ধা হলে দশমী বিদ্ধা নাও হতে পারে। এজন্যই প্রচলিত পঞ্জিকার তালিকায় যেখানে একাদশী দিন নিয়ে গোস্বামীমতে পরাহে লেখা থাকে। সেখানে নিম্বার্ক মতে পরাহে কোথাও লেখা থাকে। কিন্তু নিম্বার্ক মতে পরাহে লেখা থাকলেও কিছু কিছু একাদশীর বেলায় গোস্বামী মতে পরাহে লেখা দেখতে পাওয়া যাবে না।

উদাহরণ ঃ (১) লোকনাথ পঞ্জিকার ১৪১৩ বাংলা এর তারিখ ২৯/১২/২০০৬ইং শুক্রবার দেখুন। এই দিন রাত্রি ৩/১৯/৪৯ সেঃ পর্যন্ত দশমী আছে। পরে একাদশী আরম্ভ হয়ে পরেরদিন ৩০/১২/২০০৬ইং শনিবার রাত্রি ১/১৪/২২ সেঃ পর্যন্ত থাকবে বলা হয়েছে। এখন দশমী শুক্রবার রাত্রি ১২টা অতিক্রম করায় পরদিনের একাদশী কপাল বেধ হয়েছে। তাই নিম্বার্ক মতে শনিবার নয় বরং রবিবার দ্বাদশী দিনে একাদশী ব্রত করতে হবে।

আবার শনিবার প্রাতে সূর্যোদয় ৬/৫১/২৪ সেঃ গতে লেখা আছে। এই সময় থেকে ১ঘন্টা ৩৬ মিনিট বিয়োগ করলে পাওয়া যায় ৫/১৫/২৪ সেঃ। একাদশী এই সময়ের পূর্বে রাত্র ৩/১৯/৪৯ সেঃ গতে আরম্ভ রয়েছে। তাই এই একদশী দশমী বা অরুনোদয় বিদ্ধা নয়। ফলে গৌড়ীয় মতে একাদশী ৩০/১২/২০০৬ইং শনিবারই হবে।

সুতরাং দেখা গেল নিম্বার্ক মতে কোনদিন একাদশী না হলেও গৌড়ীয় মতে ঐদিন একাদশী হতে পারে।

যদি একাদশী পূর্বরাত্রি বা কপালবিদ্ধা না হয় তবে গৌড়ীয় এবং নির্ম্বাক মতে একই দিনে একাদশী হবে। নীচের উদাহরণ লক্ষ্য করুন।

উদাহরণ ঃ (২) উপরোক্ত পঞ্জিকার ৫৭ পৃষ্ঠার ৬/৬/২০০৬ইং মঙ্গলবার দেখুন। ঐ দিন রাত্রে ৯/৫/৩৬ সেঃ পর্যন্ত দশমী ছিল। পরে একাদশী আরম্ভ হয়ে পরের দিন ৭/৬/২০০৬ইং বুধবার রাত্রি ১০/৩৫/৪২ সেঃ পর্যন্ত থাকবে বলা হয়েছে। দশমী মঙ্গলবার ৯/৫/৩৬ সেঃ পর্যন্ত হওয়ায় একাদশী অর্ধ্বরাত্রি অথবা কপাল বিদ্ধা হয় নাই। তাই নিম্বার্ক মতে বুধবার ৭/৬/২০০৬ইং তারিখে একাদশী হবে। আবার বুধবার প্রাতে সূর্যোদয় ৫/২৪/৩২ সেঃ গতে। এই থেকে ১ ঘন্টা ৩৫ মিনিট বিয়োগ করলে পাওয়া যায় মঙ্গলবার রাত্রি ৩/৪৮/৩২ সেঃ একাদশী এই সময়ের অনেক পূর্বেই অর্থাৎ রাত্রি ৯/৫/৩৬ সেঃ গতে আরম্ভ হওয়ায় এটি অরুনোদয় বা দশমী বিদ্ধা হয় নাই। তাই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণরাও ৭/৬/২০০৬ইং তারিখে বুধবার একাদশী করবেন। এখন দেখা গেল গৌড়ীয় মতে দশমী বিদ্ধা এবং নির্ম্বাক মতে অর্দ্ধরাত্রি না হলে উভয় মতেই একই দিনে একাদশী হবে। এককথায় একাদশী কপাল বিদ্ধা অথবা অর্ধ্বরাত্রি বিদ্ধা না হলে উভয় মতেই একাদশী একই দিনে হবে। সুতরাং বলা যায় একাদশী যদি দশমী বা অরুনোদয় বিদ্ধা হয় তবে উভয় মতেই দ্বাদশী দিনে একাদশী হবে। কোন কোন সময় প্রচলিত পত্রিকাগুলিতে নিম্বার্কমতে একাদশী নির্ধারনে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ভুল তথ্য সন্নিবেশ করেছে-এরূপ দেখতে পাওয়া যায়। নিচে দুটি উদাহরন লোকনাথ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪১৩ বাংলা থেকে উল্লেখ করা হলো।

উদাহরণ (৩) ঃ উপরোক্ত পঞ্জিকার ১১৫ পৃষ্ঠা দেখুন। সেখানে লেখা আছে একাদশীর উপবাস ৫/৮/২০০৫ইং শনিবার। কিন্তু নিম্বার্কমতে পরাহে-অর্থাৎ নিম্বার্কমতে পরের দিন ৬/৮/২০০৫ইং রবিবার দ্বাদশী দিনে একাদশী ব্রত হবে। অথচ ৪/৮/২০০৫ইং তারিখে দশমী রাত্রি ১১/৪৩/৪৮ সেঃ পর্যন্ত থাকবে। তারপর একাদশী আরম্ভ হবে। এখন

দশমীতো অর্দ্ধরাত্র-অর্থাৎ ১২টা অতিক্রম করে নাই। তাহলে একাদশী অর্দ্ধরাত্রি বা কপালবিদ্ধা নয়। তাহলে নিম্বার্ক মতেও ৫/৮/২০০৫ইং তারিখে একাদশী হওয়ার কথা। আবার দশমী বা অরুনোদয়বিদ্ধা না হওয়ায় গৌড়ীয় মতেও ৫/৮/২০০৫ইং মঙ্গলবার একাদশী হওয়ার কথা। কিন্তু ৫/৮/২০০৫ইং তারিখে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা আরম্ভ। ঐদিন বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ উপবাস করেন। তাই নিম্বার্ক এবং গৌড়ীয় মতেও একাদশী পরের দিন ৬/৮/২০০৫ইং রবিবার হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা একটি অতি পবিত্র আরোপন উৎসব। তাই এই একাদশীকে ইস্‌কন এর একাদশী চার্টে পবিত্রারোপন একাদশী বলা হয়েছে।

(চলবে)

যত নগরাদি গ্রামে

পনতীর্থ ধামে ইস্‌কন কর্তৃক আয়োজিত সুবিশাল মহোৎসব-২০০৭

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) সিলেটে পনতীর্থ স্মৃতি তীর্থের ভক্তবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে মহাবিষ্ণুর অবতার, গৌর আনার ঠাকুর শ্রীশ্রী অদ্বৈত আচার্য্য ঠাকুর-এর আবির্ভাব স্থল-এর নিকটবর্তী স্থান গড়কাঠিতে ইসকন সিলেটের শাখা-শ্রী শ্রী পনতীর্থ স্মৃতি ধামে স্নান যাত্রা উপলক্ষে দুইদিন ব্যাপী ব্যাপক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃতের অন্যতম আচার্য্য গুরু ও জিবিসি শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ হেলীকপ্টারে গমন করে দর্শন দান ও হরিকথা পরিবেশন করে অগণিত মানুষের উপর কৃপাবারী বর্ষন করেন। এবং তিনি মূল মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

অনুষ্ঠান মালার প্রথম দিনে ভোর ৪:৩০ মঙ্গল আরতি, ৭:১৫ দর্শন আরতি, ৭:৩০ গুরু পূজা, সকাল ১০:০০ প্রায় ৫০০ শত ভক্ত কীর্তনসহকারে শ্রী অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাবস্থলে গমন এবং ঐ পাড়ের মন্দিরে কীর্ত্তন করে পুনঃ মন্দিরে প্রত্যাবর্তন দুপুর ১২:০০ মহাভোগ রাগ অন্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ। দুইদিন ব্যাপী দিন রাত প্রায় ১০০ বস্তা চাউল-ডালের খিচুরি প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা : ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইসকনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপাদ চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন ইসকনের অন্যতম গুরু ও জিবিসি শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ। বিশেষ অতিথি হিসাবে, উপস্থিত ছিলেন ডাঃ জগদীশ দত্ত (ভূমিদাতা ও মুল মন্দির দাতা) তারাপদ পাল প্রাক্তন উপসচীব (ভূমিমন্ত্রণালয়) বিমল চন্দ দাস-উপসচীব খাদ্য ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)। অবঃ মেজর ডাঃ ইন্দ্রজিত কুণ্ড (ফ্যামিলী মেডিসিন মোঃ সাঈদ মোহাম্মদ নেসা, থানা নির্বাহী কর্মকর্তা তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ। মোঃ রাখাব উদ্দিন, ইউপি চেয়ারম্যান বাদাঘাট, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ, প্রমুখ। বক্তা হিসাবে থাকেন শ্রীপাদ গদাধর প্রিয় দাস ব্রহ্মচারী, ইসকনের সহসভাপতি ও অধ্যক্ষ, তারাগঞ্জ মন্দির। সুমঙ্গল গৌর দাস (সহ-সভাপতি হরেকৃষ্ণ নাম হট্ট সংঘ, সিলেট) তমাল প্রিয় গৌরদাস (সাঃ সম্পাদক হরেকৃষ্ণ নামহট্ট, সিলেট) আরও বিভিন্ন ইসকন মন্দিরের অধ্যক্ষ এবং দুর-দুরান্ত থেকে আগত আলোচকবৃন্দ। আলোচনা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইসকন হরেকৃষ্ণ নাম হট্টের অন্যতম ভক্ত প্রবর শ্রী বুদ্ধি গৌর দাসাধিকারী।

সন্ধ্যা ৭:০০ শ্রীশ্রী গৌর সুন্দরের আরতি কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। আরতি পরিচালনা করেন-শ্রী মহাসংকীর্তন দাস ব্রহ্মচারী, মৃদঙ্গে পান্ডব গোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী।

রাত্রি ১০:০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয় ভজন কীর্ত্তন। ভজনকীর্ত্তন পরিবেশন করেন রেডিও ও টিভি শিল্পি এবং সুরকার-ডি.কে. জয়ন্ত, প্রখ্যাত টিভি শিল্পী পংকজ দে-(জমিদাতা)। রাত্রি ১২:০০ টায় পরিবেষ্টিত হয় সম্পূর্ণ বৈদিক নাটক 'ভক্ত হরিদাস' পরিবেশনায়-ইসকন অন্যতম গুরু ও জিবিসি শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের কৃপাধন্য শিষ্য ও শিষ্যা এবং ইয়থফোরামের ভক্তগণ। নাটকটি প্রযোজনা করেছেন, দেব দুলাল দেবানন। নির্দ্দেশনায় শ্রী বলদেব কৃপা দাস, সভাপতি হরেকৃষ্ণ নাম হট্ট, ইয়থফোরামের পরিচালক। দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচীর মধ্যে সকাল ৮:০০ পর্যন্ত পূর্বের দিনের মতো। সকাল ৮:০০ টায় লীলা কীর্তন পরিবেশিত হয়, পরিবেশন করেন, ইসকন সুনামগঞ্জের অন্যতম ভক্তপ্রবর সংকল্প দাসাধিকারী। সকাল ১০:৩০ মিঃ ১০৮ প্রদীপে গঙ্গা আরতি শেষে লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দ এই পুন্য তীর্থে স্নান করে পূত পবিত্র হন। এত ভক্ত সমাগম আর কোন বার হয় নাই। স্থানীয় পত্রিকা মতে ৭ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়।

হবিগঞ্জ নরসিংহ মন্দিরে ধর্মসভা ও দীক্ষানুষ্ঠান

বিশ্ববরেণ্য ইসকনের অন্যতম জি.বি.সি ও আচার্য্য শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ এর হবিগঞ্জ শ্রীশ্রী নরসিংহ জিউ ইসকন মন্দিরে প্রথম শুভাগমন উপলক্ষে ধর্মসভা ও দীক্ষা অনুষ্ঠান। বিগত ২৫শে জানুয়ারি '০৭ খ্রিঃ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ ঘটিকায় শ্রীল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ ইস্‌কন শ্রী শ্রী নরসিংহ জিউ মন্দির প্রাঙ্গনে শুভাগমন করেন। এতে উপস্থিত হাজার হাজার ভক্ত বিপুল উৎসাহ ও করতালির মাধ্যমে গুরু মহারাজকে পুষ্প সজ্জিত লাল গালিচায় স্বাগত জানায়। পরে গুরু মহারাজ ধর্মসভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করে প্রবচন প্রদান করেন এবং বৎসরে একবার হবিগঞ্জে আসার উৎসাহ দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নিখিল রঞ্জন ভট্টাচার্য, বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন-শ্রীমতি দেবকী দেবী দাসী (জার্মান), শ্রী চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী ইসকন, ঢাকা, শ্রী নবদ্বীপ দ্বিজ গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী ইসকন, সিলেট, বাবু সংকর পাল-এডভোকেট, স্বরাজ বিশ্বাস, এডভোকেট ত্রিলোক কান্তি চৌধুরী (বিজন)। প্রমথ সরকার (ইসকন আজীবন সদস্য), পতিত উদ্ধারণ দাস ব্রহ্মচারী, জ্যোতির্ময় গৌর দাস ব্রহ্মচারী, জগৎগুরু গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী, সুখী সুশীল দাস ব্রহ্মচারী, শুভ নিতাই দাস ব্রহ্মচারী, সুমুখ গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী, বিমল চন্দ্র দাস, (উপ সচিব) যুগধর্ম দাসাধিকারী (কমিশনার) সহ আরও অনেকে। ঢাকা ইসকন মন্দিরের ভক্তবৃন্দের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভজনকীর্ত্তন, তুলসী, আরতি, গৌর আরতি ও বৈদিক নৃত্য পরিবেশিত হয়। রাত ১০ ঘটিকায় দীক্ষা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে গুরু পদাশ্রয় লাভ করেন-শতাধিক ভক্ত। হরিণাম দীক্ষা প্রাপ্ত হয় ১৫০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭৫ জন। ব্রাহ্মণ দীক্ষা প্রাপ্ত হয় ৮০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫ জন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সংবাদদাতা-শ্রী সদাশ্রয় দাসাধিকারী

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপযজ্ঞ প্রসঙ্গে

ঢাকার তুরাগ থানার ধউর গ্রামে শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির ও হরেকৃষ্ণ নামহট্ট সংঘের (রেজিঃ নং ৪৪১/০৫) আয়োজনে গত ০৯/০২/০৭ ইং তারিখে রোজ শুক্রবার হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপযজ্ঞ উপলক্ষে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনা ও পৌরহিত্যের দায়িত্ব পালন করেন শ্রী প্রহলাদ কৃষ্ণ দাস (ইসকন, নরসিংদী)।

উক্ত অনুষ্ঠানে অগণিত ভক্ত একসাথে ২.৩০ ঘণ্টা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন অতঃপর জপকারী ভক্তদের নামে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়। অতঃপর শ্রীশ্রী রাধামাধবের ভোগ নিবেদন ও ভোগ আরতির পরপরই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপযজ্ঞ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচ্য বিষয়সমূহ হলো, কলিযুগের একমাত্র সাধন পন্থা কি, শ্রীনাম সর্বপাপ নাশক, শ্রীনাম মুক্তি প্রদান করে, শ্রীনাম নিত্য সম্পদ প্রদান করে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের শক্তি ও ফল, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করুন সদা সর্বত্র, উক্ত বিষয়সমূহ আলোচনান্তে সর্বজীবের মঙ্গল কামনায় বিশেষ প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র জপযজ্ঞে নরসিংদী, ডুমনি, আমাইয়া, টঙ্গী, চেরাগআলী, বোর্ডবাজার, সাইনবোর্ড, ইছর, মজলিশপুর, স্কয়ার, কাশিমপুর, আশুলিয়া, রুস্তমপুর, সাইপারা, বিরুলিয়া, দিয়াবাড়ি, ধউর ট্রেনিং সেন্টার, ভাদামসহ স্থানীয় অসংখ্য ভক্তবৃন্দের সমাগম হয়। উপস্থিত সকলকে কৃষ্ণপ্রসাদে আপ্যায়ন করানো হয় এবং অসংখ্য প্যাকেটে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নিবেদক-শ্যামস্বরূপ দাসাধিকারী

শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের শুভাগমনে পণতী
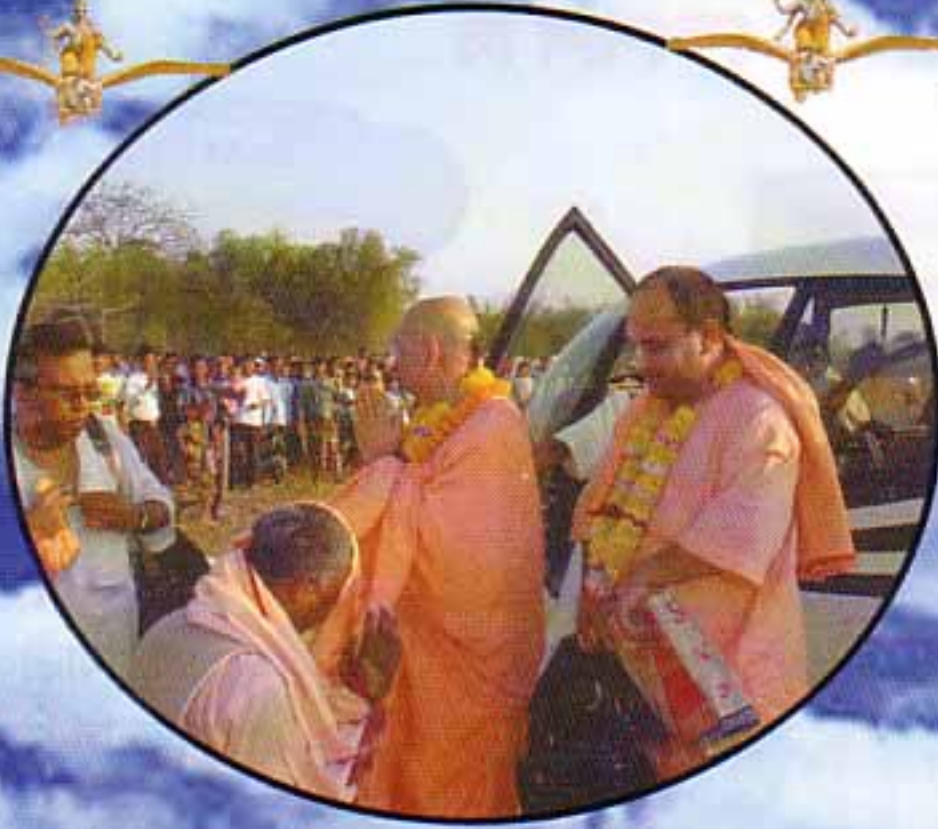
নে পণতীর্থ ধামে ভক্তবৃন্দের মহাসমাবেশ- ২০০৭
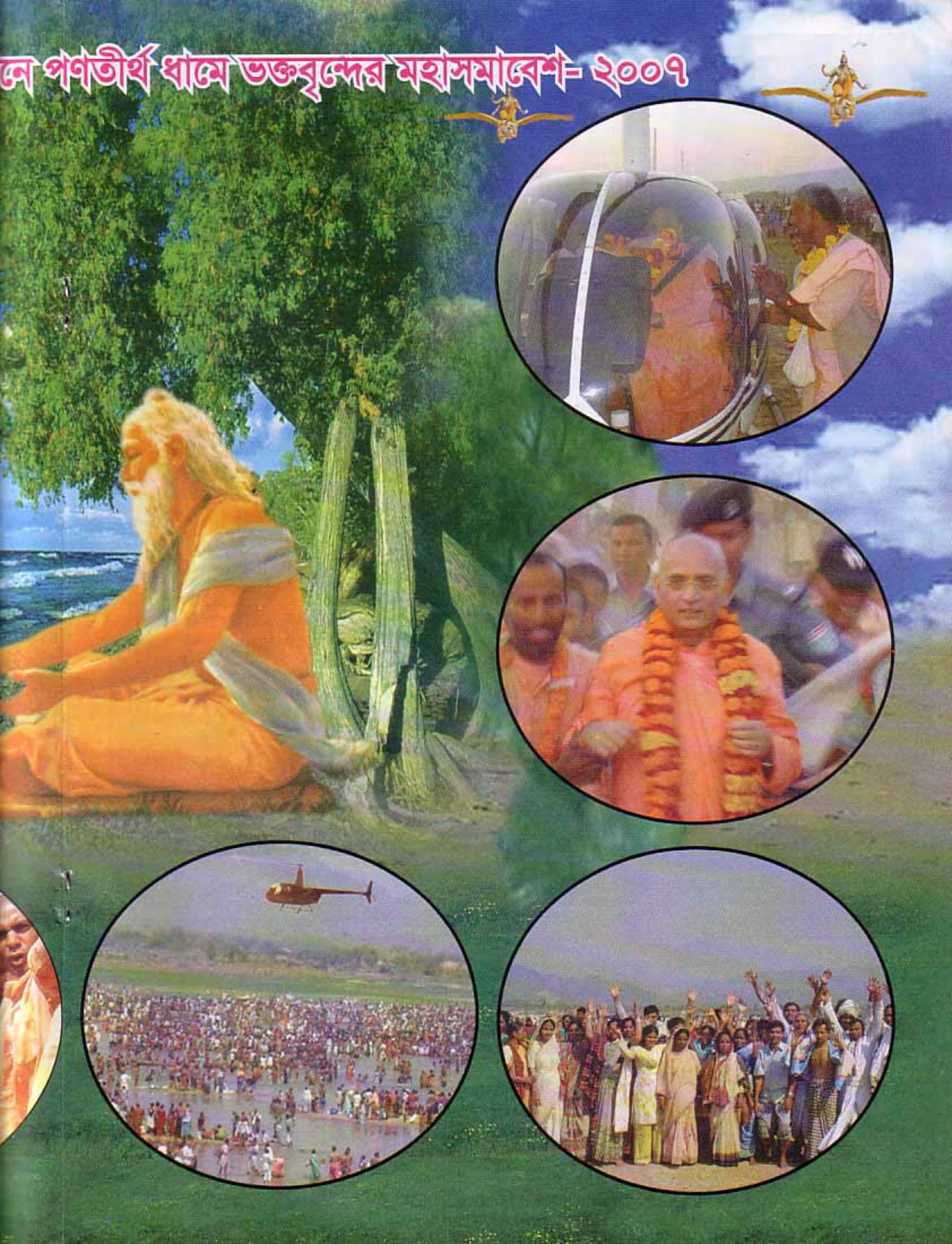
স্বামীবাগে গৌরপূর্ণিমা উৎসব- ২০০৭

গৌরপূর্ণিমা উৎসবে শ্রীশ্রী গৌরনিতাইকে অভিষেক করানো হচ্ছে
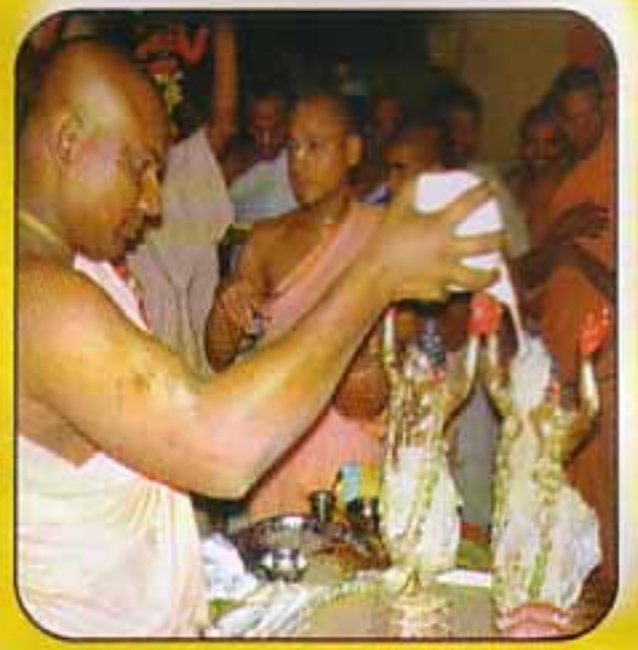
গৌরপূর্ণিমা উৎসবে অভিষেক করছেন শ্রী পতিত উদ্ধারণ দাস ব্রহ্মচারী

হবিগঞ্জ নৃসিংহ মন্দিরে পাঠদানরত শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ
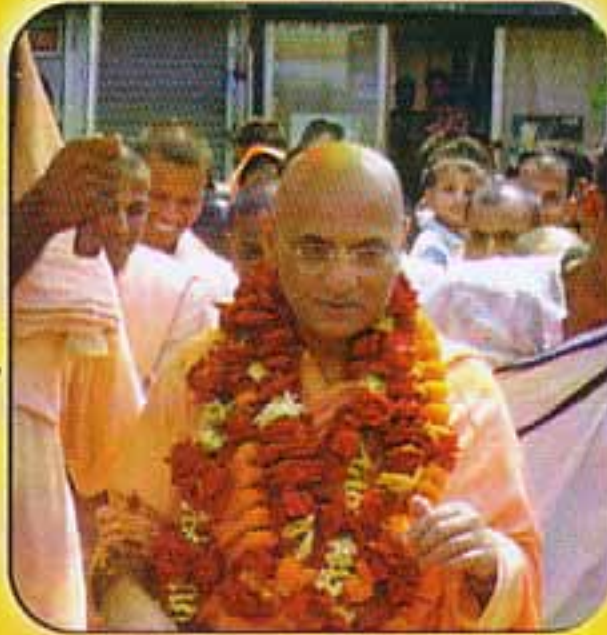
স্বামীবাগে শুভাগমন শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

স্বামীবাগে শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজের ব্যাসপূজা অনুষ্ঠান- ২০০৭
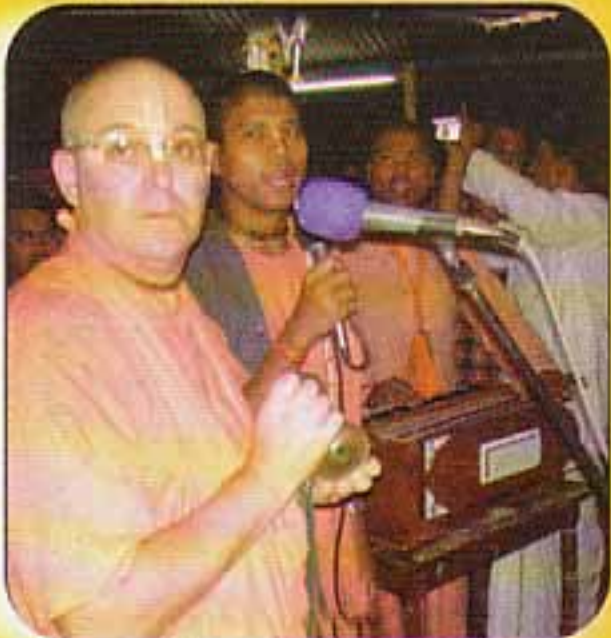
স্বামীবাগে সংকীর্ত্তনরত শ্রীল প্রভাবিষ্ণু স্বামী মহারাজ

স্বামীবাগে পাঠদানরত শ্রীল প্রভাবিষ্ণু স্বামী মহারাজ

স্বামীবাগে পাঠদানরত শ্রীল ভক্তিবিকাশ স্বামী মহারাজ

জগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থণারত শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

হবিগঞ্জ নৃসিংহ মন্দিরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ

হবিগঞ্জ নৃসিংহ মন্দিরে সঙ্গীত পরিবেশনে শ্রীমতি দেবকী দেবী দাসী

বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে

—শ্রী অশ্বিনী কুমার সরকার

ব্রাহ্মণ্যবাদ, মৌলবাদ ও সনাতন ধর্মপ্রসঙ্গ

বিশ্বের অধিকাংশ হিন্দু বর্তমানে যে ধর্ম অনুসরণ করে চলেছে, তার সাথে উৎকট 'মৌলবাদ' নামীয় ধারণা সম্পৃক্ত নয়। তাই মৌলবাদ হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরীণ কোনো সমস্যা নয়। হিন্দু সমাজের জন্য সমস্যা হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদ। ব্রাহ্মণ্যবাদ ও মৌলবাদের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক কোনো মিল নেই এ কথা সত্য; তবে মনগড়া মতবাদ অর্থে উভয়ের মধ্যেই মিল আছে। কোনো শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যেমন থাকে, তেমনি তার একটি পারিভাষিক (লোক কথিত নিন্দাসূচক) অর্থও কোনো সময়ে সৃষ্টি হতে পারে। মৌলবাদের মতো ব্রাহ্মণ্যবাদ মূলত তেমনি একটি দ্ব্যর্থক শব্দ।

এখন দেখা যাক 'ব্রাহ্মণ্যবাদ' কথাটি কারা, কখন কীভাবে ব্যবহার শুরু করে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যবাদ কথাটির প্রথম ব্যবহার শুরু হয় ভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে। ভিন্ন ধর্ম বলতে আমি সনাতম ধর্ম বহির্ভূত ধর্মগুলোকে বোঝাচ্ছি। ওইসব ধর্মের অনুসারীরা 'ব্রাহ্মণ্যবাদ' কথাটির ব্যবহার শুরু করে হিন্দু অনুসৃত ধর্ম ও সমাজের সমালোচনা করতে গিয়ে। তারা অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে যে, হিন্দু সমাজে যারা নিজেদেরকে উচ্চবর্ণের বলে দাবি করে চলেছে, তারা আসলে জ্ঞান-বিজ্ঞান কিংবা গুণের দিক থেকে উচ্চ নয়। বয়সও তাদের এ উচ্চতার কোন মাপকাঠি নয়। তাদের এ দাবির ভিত্তি হল জন্ম তথা বংশ। এ কারণে ব্রাহ্মণের পুত্রই সমাজে ব্রাহ্মণ হচ্ছে; আর এ বংশানুক্রমিক শ্রেষ্টত্বের উপরই দাঁড়িয়ে আছে হিন্দু সমাজের জাতিভেদরূপ বিশাল সৌধ। জাতিভেদ প্রথায় কোন জাতির সাথে কোন জাতির মিল নেই; এমন কি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও রয়েছে বিস্তর বাধা-বিপত্তি– যা চলমান বিশ্বের বাস্তব অবস্থার সাথে একেবারেই অসঙ্গতিপূর্ণ। তা সত্ত্বেও পুরো বিষয়টাকেই কৌশলে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ কারণে তারা হিন্দু অনুসৃত ধর্মের নামের প্রতিশব্দ হিসেবে 'ব্রাহ্মণ্যবাদ' কথাটি ব্যঙ্গার্থে ব্যবহার করা শুরু করে। শব্দটি যেহেতু ধর্মের নামের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়, তাই ব্রাহ্মণ্যবাদকে কেউ কেউ ব্রাহ্মণ্যধর্মও বলতে থাকে। সুতরাং ব্রাহ্মণ্যবাদ কিংবা ব্রাহ্মণ্যধর্ম বলতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-ব্রহ্মচারীদের দ্বারা প্রচারিত ধর্মের অকৃত্রিম মৌলনীতি বোঝায় না; এ মতবাদ হচ্ছে 'ব্রাহ্মণ পদে' অধিষ্ঠিত হওয়ার অযোগ্য কিছুসংখ্যক শাস্ত্রজীবী নামধারী ব্যক্তির দ্বারা প্রচারিত মনগড়া অথবা গোষ্ঠীস্বার্থভিত্তিক একটি ভেদমূলক মতবাদ। এর সাথে বৈদিক দর্শনের আসলে কোনো মিল নেই। দীর্ঘদিন যাবৎ বিনা প্রতিবাদে সমাজে চলে আসছে বলেই ব্রাহ্মণ্যবাদকে ধর্ম কিংবা সংস্কৃতির অংশ বলে মেনে নিতে হবে কেন? এর পক্ষে কী যুক্তি কিংবা শাস্ত্রীয় ভিত্তি আছে? বেদ-ভাগবত কিংবা রামায়ণ-মহাভারতে এর পক্ষে সমর্থনসূচক কোন উক্তি আছে কি? যদি তা না থেকে থাকে, তাহলে ধর্ম থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদকে আলাদা করে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থেই বাদ দিতে হবে। এ কাজে গড়িমসি করার অর্থ হবে অধঃপতন কিংবা অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার পথকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখা।

ভারতের প্রবীণ শাস্ত্রজীবী এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিশিষ্ট নেতা ড. ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তীকে ভারতীয় সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক প্রবক্তা বলে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু বংশানুক্রমিক বর্ণপ্রথায় বিশ্বাসী একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব কী করে ভারতীয় সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক প্রবক্তা বলে আখ্যায়িত হতে পারেন, তা আমার কাছে আদৌ বোধগম্য নয়। বর্ণবাদ কেবল ভারত-বাংলাদেশের সংবিধান বিরোধী নয়; এটা জাতিসংঘের সার্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার সনদেরও পরিপন্থী। জাতিসংঘের সনদে স্বাক্ষরকারী কোন রাষ্ট্রের নাগরিক কিছুতেই বর্ণবাদ সমর্থন কিংবা তার পক্ষে বক্তব্য রাখতে পারেন না। তাহলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রবীণ নেতা ড. ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী তা সমর্থন করেন কীভাবে? এ প্রশ্নের উত্তর তার অথবা তার সমর্থনকারীদের অবশ্যই দেওয়া উচিত। তা না দিয়ে হিন্দুত্ববাদের (ধর্মের নামে) ধোঁয়া তুলে অহেতুক উত্তেজনা ছড়ানো হয় কেন? এটা কি মূল সমস্যা পাশ কাটানোর কোন কৌশল নয়? যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ব্যতীত বর্ণবাদ আড়াল করার কোন তত্ত্বে প্রকৃত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শামিল হওয়া কি সুবিবেচনাপ্রসূত হতে পারে? সমাজ দর্পণ আষাঢ়-১৪১০ সংখ্যায় বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি শ্রীশিবশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ও হিন্দু পরিচয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। কিন্তু শুধু বললে কিংবা আহ্বান জানালে কি সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয়? সমাজে ঐক্যের ভিতটা কোথায়? কিসের ভিত্তিতে তিনি ঐক্য প্রত্যাশা করছেন? ব্রাহ্মণ্যবাদ সম্পর্কে তার অভিমত কী? এ মনগড়া মতবাদ সম্বন্ধে তার অবস্থান স্পষ্ট করছেন না কেন? ব্রাহ্মণ্যবাদ এড়িয়ে চলে কিংবা তা বহাল রেখে কি সমাজে ঐক্য স্থাপনের কথা ভাবা যায়? এ প্রশ্নের উত্তর আগে দিতে হবে। ধর্ম সম্পর্কে কথা বলতে চাইলে স্পষ্ট কথা বলতে হবে। অস্পষ্ট কিংবা বিভ্রান্তিকর কোন বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা ব্রাহ্মণ্যধর্মের কথা বলতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই বাংলার সেন রাজবংশের নাম সামনে চলে আসে। সেন রাজবংশের কৃতিপুরুষ বিজয়সেন প্রথম জীবনে একজন সামন্ত রাজা হিসেবে দেশ শাসন শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশই তার শাসনাধীনে চলে আসে। বস্তুত বিজয়সেনই ছিলেন সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ। সেনবংশীয় রাজারা ছিলেন ব্রহ্মক্ষত্রিয়। ব্রহ্মক্ষত্রিয় তারাই যারা ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষত্রিয় হন। শাস্ত্রানুযায়ী ক্ষত্রিয়ের কাজ রাজ্য শাসন ও তা রক্ষা করা; আর ব্রাহ্মণের কাজ হচ্ছে পৌরহিত্য, জ্ঞানদান ও ধর্ম প্রচার করা। এখানে দেখা যায়, সেনবংশীয়রা বর্ণ পরিবর্তন করে ক্ষত্রিয় হয়েছিলেন। তাদের ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষত্রিয় হওয়ার পেছনে কেবল দেশ শাসনের আকাঙ্ক্ষা কাজ করেনি; পাল শাসনামলে অকার্যকর হওয়া বংশানুক্রমিক বর্ণপ্রথা পুনরুজ্জীবিত করার ইচ্ছাটাও প্রবলভাবে কাজ করেছিল। এ কারণে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সবসময় ব্রাহ্মণবংশীয়দেরই নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে বিজয় সেনের উত্তর পুরুষ রাজা বল্লাল সেনই বংশানুক্রমিক বর্ণপ্রথার আদলে কৌলীণ্য প্রথা প্রবর্তন করে বস্তুত ব্রাহ্মণ্যবাদকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ ব্রাহ্মণ্যবাদের কবলে পড়ে বৌদ্ধরা ব্রাত্যজনে এবং কোন কোন প্রতিবাদী ব্রাহ্মণগোষ্ঠী শূদ্রে (বিশেষ করে নমঃশূদ্রে) পরিণত হয়। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তার 'কালচারের বিবর্তন' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "বল্লাল সেনের কৌলীণ্য প্রথার কবলে পড়ে পালযুগের অশ্বারোহীরা হাড়ি, বাগদি ও ডোম শ্রেণীতে পরিণত হয়।" এর ফলে এদেশের অপাংক্তেয় ব্রাত্যজন ও তথাকথিত নিম্নবর্ণের কৈবর্ত শ্রেণীর মানুষজনদের মনের মধ্যে যে তীব্র ঘৃণা, ক্ষোভ ও ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়, তাতে স্বাভাবিকভাবেই তারা সেন রাজবংশের বিরুদ্ধে ভয়ানক বিদ্বেষ পরায়ণ হয়ে উঠে। তারা মনেপ্রাণে সেন রাজবংশের পতনই কামনা করতে থাকে। এ পরিস্থিতিরই পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন জনৈক তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ১২০১ থেকে ১২০৫ খৃঃ মধ্যে) তিনি একরূপ বিনা বাধায় বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে নদীয়াস্থ রাজনিবাস থেকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হন। রাজা তথা শাসনকর্তা অলস, অকর্মণ্য, অদূরদর্শী কিংবা গণবিচ্ছিন্ন হলে তার পরিণাম এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

ব্রাহ্মণ্যবাদ সম্পর্কে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি শ্রীশিবশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের ভূমিকা আমার কাছে খুবই অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়। তার সম্পাদিত মাসিক সমাজ দর্পণ, পৌষ-১৪০২ সংখ্যার প্রশ্নোত্তর পাতায় বগুড়ার শ্রী মনোরঞ্জন সরকারের একটি প্রশ্ন ছিল, "ব্রাহ্মণ্যবাদ কী?" তিনি তার উত্তরে বলেছেন, "সমাজে ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য বিস্তারই ব্রাহ্মণ্যবাদ। মানব সমাজ দীর্ঘদিনের। প্রথমে ছিল মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ও সমাজ। দীর্ঘদিন চলার পর মাতৃতান্ত্রিক পরিবার পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয় পুরুষ শাসিত পরিবার ও সমাজে। এরপর ব্রাহ্মণগণ সমাজের প্রধানরূপে এলেন। তখন পুরোহিতগণ সমাজের বিধিমালা রচনা করতেন এবং সমাজ চালাতেন। প্রথানুযায়ী পুরোহিত হতেন ব্রাহ্মণদের মধ্যে থেকে। আর তখন থেকেই সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রচলিত হয়।" উল্লিখিত উত্তরে প্রথমত লক্ষ্য করার মতো যে বিষয়টি তা হলো ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতের কোন সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়নি। ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা নির্ধারণ না করেই ব্রাহ্মণ্যবাদের যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে 'সনাতন ধর্ম' ও ব্রাহ্মণ্যবাদের মধ্যে যে পার্থক্য তা স্পষ্টতই চাপা পড়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থায় পূজা-অর্চনা কিংবা বিবাহ-শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হতো কিনা? হলে তখন তাতে পৌরহিত্য করতেন কারা? এ প্রশ্ন দুটোর সদুত্তর কিংবা দিকনির্দেশনা তার উত্তরে অনুপস্থিত। তাই আমি মনে করি তার উল্লিখিত বক্তব্য ব্রাহ্মণ্যবাদের কোন সঠিক ব্যাখ্যা নয়। এটা আসলে অপব্যাখ্যা। তবে আরো স্পষ্ট করে বলতে বলা হলে আমি বলব 'কূটকৌশল'। কূটকৌশল বলব আমি এ কারণে যে, এ ধরনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদকেই হিন্দু অনুসৃত 'সনাতন ধর্ম' বলে চালিয়ে দেয়ার একটা প্রয়াস চালানো হয়েছে। তার এ প্রয়াস সুশিক্ষিত সচেতন মহলের উপর কোন প্রভাব না ফেললেও সমাজের অধিকাংশ সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগণ এর মাধ্যমে বিভ্রান্ত হতে পারেন ভেবে প্রশ্ন ও উত্তর হুবহু তুলে ধরে এ সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমি একটি সামাজিক দায়িত্ব বলে মনে করেছি।

অধিকাংশ হিন্দু বর্তমানে যে ধর্ম মেনে চলছে, তা অযোগ্য শাস্ত্রজীবীদের মনগড়া কোন মতবাদ নয়। হিন্দু অনুসৃত ধর্মের ভিত্তি হলো বেদ; আর এ বেদভিত্তিক 'সনাতন ধর্ম' স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট ও প্রবর্তিত। অবতার পুরুষ ও মুনি-ঋষি (ব্যাস, শুক, পৈল, জৈমিনী, বৈশাম্পায়ণ, সুমন্ত প্রমুখ) পরম্পরায় এ ধর্ম লোক সমাজে প্রচারিত হয়েছে। গীতা যথাযথ ও মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে তার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সুপ্রাচীন সনাতন ধর্মের আধ্যাত্মিক দিক খুবই সমৃদ্ধ; তবে এর ব্যবহারিক দিকটা কালের বিবর্তনে অপব্যাখ্যাকারী শাস্ত্রজীবীদের কবলে পড়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আমার মতে ব্রাহ্মণ্যবাদই হচ্ছে এ কুসংস্কারের মেরুদণ্ড স্বরূপ। হিন্দু সমাজের অমানবিক জাতিভেদপ্রথাসহ অন্যান্য সকল কুসংস্কার ও দুর্নীতিই দাঁড়িয়ে আছে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্যবাদকে অবলম্বন করে। তাই ব্রাহ্মণ্যবাদের পূর্ণ বিলোপই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণগণের নয়।

(দ্বিতীয় পর্ব আগামী সংখ্যায়)

মায়ার পরীক্ষা

— জগন্নাথ দাস

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতায় বলেছেন–

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি ।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥

"এইভাবে মদ্‌গতচিত্ত হলে, আমার কৃপায় তুমি জড় জীবনের সমস্ত প্রতিবন্ধক থেকে উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু তুমি যদি তা না করে, আমার কথা না শুনে, অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে কর্ম কর, তা হলে তুমি বিনষ্ট হবে।" (১৮/৫৮)

এই জড় জগৎ প্রতিবন্ধকে পরিপূর্ণ। এমন কি কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছা করে, তখনও তাকে অসংখ্য প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রতিবন্ধকগুলি মায়ার সৃষ্টি। মায়ার কাজই হল কৃষ্ণবিমুখ জীবকে মোহিত করে এই জড় জগতে বন্দী করে রাখা। যারা শ্রীকৃষ্ণের কাছে শরণাগত হতে আগ্রহী, তাদেরকে যাচাই এবং পরীক্ষা করাও মায়ার কাজ। এই সমস্ত পরীক্ষাগুলিকেই আমরা ভক্তি জীবনের প্রতিবন্ধক বলে মনে করি। কিন্তু এই সমস্ত পরীক্ষায় ভক্ত যখন উত্তীর্ণ হয়, তখন ভগবান তার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।

মায়াকে কষ্টি পাথরের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কষ্টি পাথরের পরীক্ষায় যেমন প্রকৃত সোনার পরিচয় ফুটে ওঠে, ঠিক তেমনি মায়ার পরীক্ষায় সফলতার মাধ্যমেই ভক্তের মহিমা প্রস্ফুটিত হয়।

মায়াকে আবার বহুরূপী বলেও গণ্য করা হয়। কষ্টি পাথর তো শুধু একরূপেই সোনার পরীক্ষা করে। কিন্তু মায়া অনন্তরূপে প্রতি মুহূর্তেই ভক্তকে পরীক্ষা করে। বহুরূপী মায়ার বহুরূপী পরীক্ষায় যিনি সাফল্য অর্জন করেন, তিনিই শুদ্ধ ভক্ত।

পরীক্ষা না হলে ভক্তের শুদ্ধতা সন্দেহাতীত হয় না। বিনা পরীক্ষায় সাধু সাজা অনেকের পক্ষেই সম্ভব। শ্রীমৎ জয়পতাকা মহারাজ এ ব্যাপারে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। অনেক সরকারী কর্মচারীই বলতে পারেন যে, তারা সম্পূর্ণ সৎভাবে কাজ করেন। কখনও ঘুষ খান না। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেউ যদি তাদের কোনও দিন ঘুষ নেবার জন্য সাধাসাধি না করে, তা হলে তারা ঘুষ খান না, কথাটা সন্দেহাতীত নয়। তারা ঘুষ পান না এবং তাই ঘুষ খাওয়ার কোনও সুযোগই তাদের নেই। সেক্ষেত্রে তাদের সাধুতা প্রমাণিত নয়। ঘুষ পাওয়া সত্ত্বেও যিনি ঘুষ খান না– তিনিই সৎ কর্মচারী।

তেমনি মায়ার পরীক্ষা বা প্রলোভন সামনে না এলে ভক্তের দৌড় বোঝা যায় না। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সামনে যদি মায়াদেবী এসে পরীক্ষা না করতেন, তা হলে তাঁর মহিমা জগতে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হত না।

অনেকেই দাবি করতে পারেন যে, তারা কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করতে সক্ষম। কিন্তু তাদের ব্রহ্মচর্যের দৌড় তখনই সুপ্রমাণিত হয়, যখন সুন্দরী রমণীর সঙ্গ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি তারা স্থির থাকতে পারেন। যেমন, স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর অনুরোধ সত্ত্বেও অর্জুন তার সঙ্গ করেন নি।

ঘুষেরও আবার মাত্রা ভেদ রয়েছে। কোনো কর্মচারী যদি ১ টাকার ঘুষ প্রত্যাখ্যান করে, সেও কিছু না কিছু নির্লোভ। আবার যে কর্মচারী কোটি কোটি টাকার ঘুষ প্রচণ্ড তীব্রতা সহকারে প্রত্যাখ্যান করে, সেও নির্লোভ। ঘুষের মাত্রা ভেদে নির্লোভত্বেরও মাত্রাভেদ প্রমাণিত হয়।

সহজ পরীক্ষায় যিনি পাশ করেন, তার মহিমা কখনই কঠিন পরীক্ষায় যিনি পাশ করেন, তার সমান হতে পারে না। তেমনি মায়া কখনো কখনো ভক্তের সামনে বেশ কঠিন পরীক্ষা উপস্থাপিত করেন। ভক্ত যখন সেই সমস্ত সুকঠিন পরীক্ষায় জয় লাভ করেন, তখনই তিনি হন শুদ্ধ ভক্ত।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি। অর্থাৎ যিনি নিষ্কপটভাবে কৃষ্ণগতচিত্ত, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সমস্ত দুর্গ অতিক্রম করবেন। সমস্ত দুর্গ বলতে বোঝায় সমস্ত সুকঠিন পরীক্ষাগুলো। দুর্গ বা প্রাচীর অতিক্রম করা কঠিন। কিন্তু যিনি কৃষ্ণগত প্রাণ, তিনি যদি পিপীলিকার মতোও ক্ষুদ্র হন, তা হলেও তিনি সেই সুকঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন। আবার কৃষ্ণগত প্রাণ না হলে ব্রহ্মার মতো মহাবীরও পরীক্ষায় বিফল হবেন। উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তিটিতে বলা হয়েছে– অথচেত্ত্বমহঙ্কারান্নশ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি। 'যদি অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে আমার কথা না শোন, তা হলে বিনাশ প্রাপ্ত হবে।' মায়া এক প্রবল প্রলোভন নিয়ে ভক্তের সামনে উপস্থিত হতে পারে। ভক্ত ভাবতে পারে, আমি মায়াকে ভোগ করব। এটিই অহঙ্কার– নিজেকে ভোক্তা বলে অভিমান করা। যার এই ভোক্তা অভিমান রয়েছে, তার পক্ষে নিষ্কপট হওয়া অসম্ভব। আর কপট ব্যক্তির পক্ষে পরীক্ষায় পাশ করা অসম্ভব। সুতরাং তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অহঙ্কারের বশে শ্রীকৃষ্ণ ও গুরুর আদেশ অবজ্ঞা করার ফলে সে অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

সুতরাং যত কঠিন পরীক্ষাই আসুক না কেন, তাতে জয় লাভ করার জন্য ভক্তকে প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রতি মুহূর্তেই পরীক্ষা চলছে। প্রতি মুহূর্তেই আমাদের পাস করতে হবে। সব সময় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে থাকলে পরীক্ষায় ফেল করার ভয় নেই। সহজ পরীক্ষায় পাস করলে কৃষ্ণ আমাদের কঠিন পরীক্ষা পাঠাবেন যাতে আমরা আরও আকুলতার সঙ্গে মহামন্ত্র জপ ও কীর্তন করতে পারি।

প্রলোভনের সামনে পড়ে যদি আমাদের নাম জপের আকুলতা ও তীব্রতা কমে যায় তো বুঝতে হবে ভোক্তা অভিমান তথা অহঙ্কার চিত্তকে আচ্ছন্ন করেছে। তখন কপটতাবশত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে পরীক্ষায় ফেল করবে।

অনেক সময় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাকে পরীক্ষায় ফেল করাবেন। শ্রীকৃষ্ণ কখনো তাঁর ভক্তের গাফিলতি বরদাস্ত করেন না। তিনি বজ্র থেকেও কঠোর, কুসুম থেকেও কোমল। যে ভক্ত নিষ্কপট, শ্রীকৃষ্ণের কুসুমকোমল কৃপার পরশে তিনি পঙ্গু হয়েও গিরি লঙ্ঘন করতে পারেন। আর কপট ব্যক্তির কাছে শ্রীকৃষ্ণ বজ্রের মতোই কঠোর। সামর্থ্য থাকলেও তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবেন না। আবার সামর্থ্যহীন ব্যক্তিও দুর্গপ্রমাণ মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাবেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছিলেন, অর্জুনের তুলনায় তাদের অনেকেই ছিলেন তিমিঙ্গিল মাছের মতোই মহাশক্তিধর। তিমিঙ্গিল মাছ তিমি মাছকেও গিলতে পারে। জড়জাগতিক হিসাবে অর্জুনের পক্ষে জয়ের কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু অর্জুন যেহেতু কৃষ্ণগত চিত্ত, তাই তিনি সমস্ত দুর্গ অনায়াসে অতিক্রম করেছিলেন। তেমনি কৃষ্ণগতপ্রাণ ভক্তও মায়ার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাতেও অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে যাবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত হল প্রাচীন ভারতের বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের সারাতিসার। পাঁচ হাজার বছর আগে মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পারমার্থিক জ্ঞানের সারভাগ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। এখানে মূল সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত শব্দার্থ, অনুবাদ এবং তাৎপর্যও উপস্থাপন করা হলো। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করা হচ্ছে—

প্রথম স্কন্ধ : "সৃষ্টি"

ষষ্ঠ অধ্যায়
নারদ মুনি এবং ব্যাসদেবের কথোপকথন

শ্লোক ১
সূত উবাচ

এবং নিশম্য ভগবান দেবর্ষের্জন্ম কর্ম চ।
ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ তং ব্রহ্মন্ ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **নিশম্য**—শুনে; **ভগবান্**—ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার; **দেবর্ষেঃ**—দেবর্ষির; **জন্ম**—জন্ম; **কর্ম**—কর্ম; **চ**—এবং; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **পপ্রচ্ছ**—জিজ্ঞাসা করলেন; **তম্**—তাঁকে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রহ্মজ্ঞগণ; **ব্যাসঃ**—ব্যাসদেব; **সত্যবতী-সুত**—সত্যবতীর পুত্র।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন : হে ব্রহ্মজ্ঞগণ, এইভাবে দেবর্ষি নারদের জন্ম এবং কর্ম-বৃত্তান্ত শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করে সত্যবতী-তনয় ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীব্যাসদেব শ্রীনারদকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্য

ব্যাসদেব নারদ মুনির পূর্ণতা সম্বন্ধে আরও জানতে উৎসুক হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি আরও প্রশ্ন করেছিলেন। এই অধ্যায়ে শ্রীনারদ মুনি বর্ণনা করবেন, যখন তিনি ভগবানের বিরহে অত্যন্ত বেদনাদায়ক অবস্থায় অপ্রাকৃত চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তখন তিনি কিভাবে ক্ষণকালের জন্য তাঁর বাণী শুনতে পেয়েছিলেন।

শ্লোক ২
শ্রীব্যাস উবাচ

ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেষ্টৃভিস্তব।
বর্তমানো বয়স্যাদ্যে ততঃ কিমকরোদ্ভবান্॥ ২॥

শ্রীব্যাস উবাচ—শ্রীব্যাসদেব বললেন; **ভিক্ষুভিঃ**—মহান পরিব্রাজকদের দ্বারা; **বিপ্রবসিতে**—দূর দেশে গমন করলে; **বিজ্ঞান**—উপলব্ধ পারমার্থিক জ্ঞান; **আদেষ্টৃভিঃ**—যাঁরা উপদেশ দিয়েছিলেন; **তব**—আপনার; **বর্তমানঃ**—বর্তমান; **বয়সি**—বাল্যকালে; **আদ্যে**—আদিতে; **ততঃ**—তারপর; **কিম্**—কি; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

শ্রীব্যাসদেব বললেন : হে দেবর্ষি, আপনার সেই গুহ্য ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে উপদেশদাতা পরিব্রাজকেরা যখন দূরদেশে গমন করলেন, তখন পূর্ব জীবনের সেই বাল্যাবস্থায় আপনি কি করেছিলেন?

তাৎপর্য

ব্যাসদেব নিজেও ছিলেন নারদ মুনির শিষ্য, এবং তাই তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার পর নারদ মুনি কি করেছিলেন সে সম্বন্ধে জানতে তিনি স্বাভাবিকভাবেই উৎসুক ছিলেন। নারদ মুনির মতো তাঁর জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্য তিনি নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। এভাবে গুরুদেবের কাছ থেকে তত্ত্ব-অনুসন্ধানের বাসনা গতিশীল পারমার্থিক জীবনের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। এই পন্থাকে বলা হয় 'সদ্ধর্ম-পৃচ্ছা'।

শ্লোক ৩

স্বায়ম্ভুব কয়া বৃত্ত্যা বর্তিতং তে পরং বয়ঃ।
কথং চেদমুদস্রাক্ষীঃ কালে প্রাপ্তে কলেবরম॥ ৩॥

স্বায়ম্ভুব—হে ব্রহ্মার পুত্র; **কয়া**—কোন্ অবস্থায়; **বৃত্ত্যা**—বৃত্তি; **বর্তিতম**—অতিবাহিত হয়েছে; **তে**—আপনি; **পরম্**—দীক্ষার পরে; **বয়ঃ**—আয়ুষ্কাল; **কথম**—কিভাবে; **চ**—এবং; **ইদম্**—এই; **উদস্রাক্ষীঃ**—আপনি ত্যাগ করেছিলেন; **কালে**—যথাসময়ে; **প্রাপ্তে**—প্রাপ্ত হয়ে; **কলেবরম্**—দেহ।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মার পুত্র, আপনি দীক্ষা গ্রহণের পর কিভাবে আপনার জীবন অতিবাহিত করেছিলেন, এবং আপনার পূর্ব দেহ যথাসময়ে ত্যাগ করার পর কিভাবে আপনি এই দেহ প্রাপ্ত হন?

তাৎপর্য

তাঁর পূর্ব জীবনে নারদ মুনি ছিলেন একজন দাসী-পুত্র, সুতরাং কিভাবে যে তিনি সচ্চিদানন্দময় চিন্ময় শরীর লাভ করেছিলেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রীল ব্যাসদেব চেয়েছিলেন সকলের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য সেই তত্ত্ব তিনি যেন ব্যক্ত করেন।

শ্লোক ৪

প্রাক্কল্পবিষয়ামেতাং স্মৃতিং তে মুনিসত্তম।
ন হ্যেষ ব্যবধাৎকাল এষ সর্বনিরাকৃতিঃ॥ ৪॥

প্রাক্—পূর্ব; **কল্প**—ব্রহ্মার একদিন; **বিষয়াম্**—বিষয়বস্তু; **এতাম্**—এই সমস্ত; **স্মৃতিম**—স্মৃতি; **তে**—আপনার; **মুনি-সত্তম**—হে মহর্ষি; **ন**—না; **হি**—অবশ্যই **এষঃ**—এই সমস্ত; **ব্যবধাৎ**—পার্থক্য নিরূপণ করা; **কালঃ**—সময়ের গতি; **এষঃ**—এই সমস্ত; **সর্ব**—সমস্ত; **নিরাকৃতিঃ**—প্রলয়।

অনুবাদ

হে মহর্ষি, যথাসময়ে কাল সব কিছু বিনাশ করে, তা হলে কিভাবে এই বিষয়-বস্তু কালের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আপনার স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করছে?

তাৎপর্য

প্রলয়ের সময় জড় দেহের বিনাশ হলেও যেমন আত্মার বিনাশ হয় না, তেমনই আধ্যাত্মিক চেতনারও বিনাশ হয় না। পূর্বকল্পে নারদ মুনির জড় শরীরে আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ হয়েছিল। জড় চেতনা হচ্ছে জড় শরীরের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক চেতনারই প্রকাশ। এই চেতনা নিকৃষ্ট, নশ্বর এবং বিকৃত। কিন্তু আধ্যাত্মিক স্তরে চিন্ময় মনের পারমার্থিক চেতনা চিন্ময় আত্মারই মতো পরা-প্রকৃতি সম্ভূত এবং তার কোন বিনাশ হয় না।

শ্লোক ৫

নারদ উবাচ

ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেষ্টৃভির্মম।
বর্তমানো বয়স্যাদ্যে তত এতদকারষম ॥ ৫ ॥

নারদ উবাচ–শ্রীনারদ মুনি বললেন; **ভিক্ষুভিঃ**–মহর্ষিদের দ্বারা; **বিপ্রবসিতে**–দূর দেশে গমন করলে; **বিজ্ঞান**–পারমার্থিক জ্ঞান; **আদেষ্টৃভিঃ**–যারা আমাকে দান করেছিলেন; **মম**–আমার; **বর্তমানঃ**–বর্তমান; **বয়সি আদ্যে**–এই জীবনের পূর্বে; **ততঃ**–তারপর; **এতৎ**–এইটুকু; **অকারষম্**–অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন : সেই মহর্ষিরা, যাঁরা আমাকে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান দান করেছিলেন, তাঁরা দূর দেশে গমন করলেন এবং আমি এইভাবে আমার জীবন অতিবাহিত করেছিলাম।

তাৎপর্য

তাঁর পূর্ব জন্মে নারদ মুনি যখন সেই মহর্ষিদের কৃপার প্রভাবে পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তখন যদিও তিনি ছিলেন পাঁচ বছর বয়সের একটি বালক মাত্র, কিন্তু তবুও তাঁর জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। সদগুরু কর্তৃক দীক্ষিত হওয়ার এটি একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। যথার্থ ভক্তসঙ্গের প্রভাবে পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করার ফলে জীবনে দ্রুত পরিবর্তন আসে। শ্রীনারদ মুনির পূর্ব জন্মে কিভাবে তা হয়েছিল এই অধ্যায়ে তা ধীরে ধীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৬

একাত্মজা মে জননী যোষিন্মূঢ়া চ কিঙ্করী।
ময্যাত্মজেহনন্যগতৌ চক্রে স্নেহানুবন্ধনম ॥ ৬ ॥

একাত্মজা–কেবলমাত্র একটি পুত্রের; **মে**–আমার; **জননী**–মাতা; **যোষিৎ**–স্ত্রীজাতি; **মূঢ়া**–মূর্খ; **চ**–এবং; **কিংকরী**–দাসী; **ময়ি**–আমাকে; **আত্মজে**–তার সন্তান হওয়ার ফলে; **অনন্য-গতৌ**–যাঁর অন্য কোন গতি ছিল না; **চক্রে**–করেছিলেন; **স্নেহ-অনুবন্ধনম্**–স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ।

অনুবাদ

আমার মাতা ছিলেন একজন অতি সাধারণ স্ত্রীলোক এবং তিনি ছিলেন দাসী; আমি ছিলাম তাঁর একমাত্র পুত্র। আমি ছাড়া তাঁর আর অন্য কোনও আশ্রয় ছিল না, তাই তিনি আমাকে তাঁর স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

শ্লোক ৭

সাস্বতন্ত্রা ন কল্পাসীদ্‌যোগক্ষেমং মমেচ্ছতী।
ঈশস্য হি বশে লোকো যোষা দারুময়ী যথা ॥ ৭ ॥

সা–তিনি; **অস্বতন্ত্রা**–নির্ভরশীল ছিলেন; **ন**–না; **কল্পা**–সমর্থ; **আসীৎ**–ছিলেন; **যোগ-ক্ষেমম**–ভরণপোষণ; **মম**–আমার; **ইচ্ছতী**–যদিও ইচ্ছুক ছিলেন; **ঈশস্য**–ভগবানের বিধান অনুসারে; **হি**–সেই জন্য; **বশে**–নিয়ন্ত্রণাধীন; **লোকঃ**–সকলে; **যোষা**–পুতুল; **দারুময়ী**–কাঠের তৈরি; **যথা**–যেমন।

অনুবাদ

তিনি যথাযথভাবে আমাকে প্রতিপালন করতে চাইতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ছিলেন না, তাই তিনি আমার জন্য কিছুই করতে পারতেন না। এই জগৎ সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই সকলেই তাঁর হাতের কাঠের পুতুলের মতো।

শ্লোক ৮

অহং চ তদ্‌ব্রহ্মকুলে উষিবাংস্তদপেক্ষয়া।
দিগ্দেশকালাব্যুৎপন্নো বালকঃ পঞ্চহায়নঃ ॥ ৮ ॥

অহম–আমি; **চ**–ও; **তৎ**–তা; **ব্রহ্মকুলে**–ব্রাহ্মণদের বিদ্যালয়ে; **উষিবান্**–বাস করতাম; **তৎ**–তাঁর; **উপেক্ষয়া**–নির্ভরশীল হয়ে; **দিক-দেশ**–দিক এবং দেশ; **কাল**–সময়; **অব্যুৎপন্নঃ**–অনভিজ্ঞ; **বালকঃ**–বালক; **পঞ্চ-হায়নঃ**–পাঁচ বছর বয়স্ক।

অনুবাদ

আমার বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর, তখন আমি ব্রাহ্মণদের বিদ্যালয়ে অবস্থান করছিলাম। আমি আমার মায়ের স্নেহের উপর নির্ভরশীল ছিলাম এবং আমার কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না।

শ্লোক ৯

একদা নির্গতাং গেহাদ্দুহন্তীং নিশি গাং পথি।
সর্পোহদশৎপদা স্পৃষ্টঃ কৃপনাং কালচোদিতঃ ॥ ৯ ॥

একদা–এক সময়ে; **নির্গতাম্**–নির্গত হয়ে; **গেহাৎ**–গৃহ থেকে; **দুহন্তীম**–দোহন করার জন্য; **নিশি**–রাত্রিবেলা; **গাম**–গাভী; **পথি**–পথমধ্যে; **সর্পঃ**–সর্প; **অদশৎ**–দংশিত; **পদা**–পায়ে; **স্পৃষ্টঃ**–আহত হয়ে; **কৃপণাম্**–অভাগিনী; **কাল-চোদিতঃ**–কালের দ্বারা প্রভাবিত।

অনুবাদ

এক সময়ে আমার অভাগিনী মা যখন রাত্রিবেলা গো-দোহন করতে যাচ্ছিলেন, তখন মহাকালের প্রভাবে তাঁর পায়ের দ্বারা আহত একটি সর্প তাঁকে দংশন করে।

তাৎপর্য

ভগবান এইভাবেই তাঁর ঐকান্তিক ভক্তকে তাঁর কাছে টেনে নেন। সেই অসহায় বালকটির একমাত্র আশ্রয় ছিল তাঁর স্নেহময়ী মাতা, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল হওয়ার জন্য ভগবান তাঁর মাকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিলেন।

(চলবে)

নামামৃত

২. বিশ্বশান্তির সূত্র হলো কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্মেষ ঘটানো। আর এই করার জন্য দরকার ভগবানের পবিত্র নামজপ ঃ

এই বিশ্ব হলো পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি। কিন্তু বদ্ধ জীব–বিশেষত তথাকথিত সুসভ্য লোকেরা ভগবানের সম্পত্তিকে নিজেদের বলে মনে করে। মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়েই মানুষ ব্যক্তি এবং সমষ্টি পর্যায়ে এরূপ দাবি করে। কিন্তু আমরা যদি প্রকৃত শান্তি চাই, তবে আমাদেরকে মন এবং সর্বোপরি এই বিশ্ব থেকে এই ধরনের ভুল ধারণা ত্যাগ করতে হবে। কারণ সম্পদ ও সম্পত্তির উপর ব্যক্তি, গোষ্ঠি এবং সমষ্টিগত মালিকানার দাবিই হলো বিশ্ব শান্তির সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক।

ভগবৎ বিদ্বেষী এবং অবিশ্বাসী তথাকথিত সভ্য লোকেরাই ভগবানের সম্পদ ও সম্পত্তির উপর নিজেদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং অবৈধভাবেই তা করে থাকেন। এই কারণেই ভগবৎ বিহীন কোন সমাজে সুখ-শান্তি থাকে না এবং থাকতে পারে না। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন, সমস্ত জীবের সবধরনের কর্মের তিনিই হলেন আসল ভোক্তা। তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক এবং একমাত্র তিনিই সর্বজীবের প্রকৃত বন্ধু। এই সব উপদেশের মর্ম বুঝে যখন সমগ্র বিশ্ববাসী বুঝতে পারবে যে ভগবানই হলেন সমস্ত কিছুর মূল এবং নিয়ন্তা, কেবলমাত্র তখনই বিশ্বশান্তি লাভ হতে পারে, অন্যথায় নয়।

এজন্য মানুষ যদি ঐকান্তিকভাবে শান্তি চায়, তবে তার চেতনাকে কৃষ্ণভাবনায় রূপান্তর বা পরিবর্তন করতে হবে। আর এই রূপান্তরের সহজ উপায় হলো ভগবানের দিব্য নাম জপ করা। অর্থাৎ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে– এই মহামন্ত্র অনুশীলন করতে হবে।

এই প্রক্রিয়া খুবই সহজ, সরল এবং ভক্তিপূর্ণ।

পাঁচশত বছরের অধিক পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভারতবর্ষে এই নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন, যা এখন ইসকনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

২. ভগবানের পবিত্র নাম জপই বিশ্বে শান্তি আনতে পারে–

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র মানুষের হৃদয়ের অভূতপূর্ব পরিবর্তন করতে পারে। রাজনীতিবিদরাই কূটকৌশলে মানবজাতির বিভিন্ন শাখা এবং বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি এবং হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টির জন্য বহুলাংশে দায়ী। ভগবানের পবিত্র নাম মানুষের চিত্তকে সহজেই পরিশোধন করতে পারে এবং এই প্রক্রিয়ায় বিশ্বে শান্তি আনতে পারে।

৩. ভগবানের পবিত্র নাম হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে মানব সমাজে প্রকৃত শান্তি, একতা এবং ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম :

মানুষ ভগবানের পবিত্র নাম জপ করলে অথবা তাঁর দিব্য কর্মাদি শ্রবণ ও স্মরণ করলে তার মধ্যে আর হিংসা-বিদ্বেষ থাকে না। এই জড় জগতে আমরা একে অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত রয়েছি। ভগবানের দিব্য নাম জপ এবং স্মরণ করলে এসব থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। কারণ ভগবানকে কেন্দ্র করে তখন সবকিছু করা হবে। আর এর ফলে সমগ্র মানব সমাজে প্রকৃত শান্তি, একতা এবং ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হতে পারে।

৪. অতীতের বড় বড় যজ্ঞের সুফল–সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব :

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা থেকে দেখা যায় ব্রহ্মা, মানব সমাজ সৃষ্টি করে যজ্ঞাদি সম্পাদনের তথা ত্যাগের কথা বলেন। যজ্ঞ শব্দের অর্থ ভগবান বিষ্ণু, বুঝায়। আর ত্যাগ শব্দের অর্থ হলো পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম সম্পাদন। এই যুগে শাস্ত্রে পারদর্শী ব্রাহ্মণ পাওয়া দুষ্কর, যারা সঠিকভাবে বেদে নির্দেশিত যজ্ঞাদি সম্পাদন করতে পারেন। এজন্য শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে– যে সংকীর্তন-যজ্ঞ সম্পাদন এবং যাজ্ঞিক পুরুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করেই পুরাকালের যাগ-যজ্ঞাদির সমস্ত সুফল অর্জন করা সম্ভব।

৫. সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্বে শান্তি এবং সমৃদ্ধি আসতে পারে :

বৈদিক যুগে জনহিতৈষী রাজারা জনগণের কাছ থেকে কর নিয়ে তা দ্বারা বড় বড় যাগ-যজ্ঞাদি সম্পন্ন করতেন। বর্তমানকালের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তদ্রুপ যাগ-যজ্ঞাদি করা সম্ভব নয়। এজন্য শাস্ত্রে এর পরিবর্তে সংকীর্তন যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। যে কোন গৃহস্থ তার ঘরেই বিনা খরচে এরূপ যজ্ঞ করতে পারেন। পরিবারের সব সদস্য একত্রিত হয়ে হাতে তালি দিয়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করতে পারেন। আর সামর্থ্য থাকলে বেশি লোক একত্রিত করেও হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ব্যবস্থা করা যায় এবং সেই সাথে ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ ভক্তবৃন্দের মধ্যে বিতরণ করা যায়। কলিযুগে তাই সংকীর্তন যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ।

৬. মায়ার বাঁধন অতিক্রম এবং অপ্রাকৃত স্তরে পৌছার জন্যও ভগবানের পবিত্র নাম জপ করা উচিত

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন "মম মায়া দুরত্যয়া"– অর্থাৎ আমার মায়াশক্তি অতিক্রম করা বদ্ধজীবের পক্ষে বড়ই দুষ্কর। আবার বলেছেন, মন্মনাভব–অর্থাৎ আমার ভাবে ভাবিত হও। অর্থাৎ শ্রীভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ ও কীর্তন করতে হবে। তাহলেই মায়ার কবল থেকে মুক্ত হয়ে বদ্ধ জীব চিন্ময় জগতে প্রবেশ করতে পারবে।

৭. ভগবানের পবিত্র নাম জপ করলে যে কেউ মুক্তি লাভ করতে পারে

জাতি-ধর্ম-বর্ণ এবং সামাজিক অবস্থান ভেদে যে কেউ ভগবানের দিব্য নাম জপের মাধ্যমে মুক্ত হতে পারে। এমনকি অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ এবং অস্পৃশ চণ্ডালও হরিনামে উদ্ধার হতে পারে। কারণ হরিনাম জপলে অথবা শুনলেও যে কারোও চিত্ত শুদ্ধি হয় এবং এর ফলেই সে উদ্ধার পায়।

সব মানুষের জপের জন্যই মহামন্ত্র

১. মহামন্ত্র জপের মাধ্যমেই সমস্ত পৃথিবীর উচিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমাকীর্তন করা :

শ্রীমদ্ভাগবতম্ আরম্ভ করার সময় শ্রীলব্যাসদেব প্রথমেই পরম সত্য বাসুদেব কৃষ্ণের প্রতি তাঁর বিনীত প্রণতি নিবেদন করেন। এরপর তিনি তাঁর পুত্র শুকদেব গোস্বামীকে শ্রীমদভাগবতম-এর মহিমা প্রকাশের জন্য শিক্ষা দেন। এই মহিমা প্রকাশের সময়ই শুকদেব গোস্বামী জয়তি (Joyati) বলে ভগবানকে মহিমান্বিত করেন। শ্রীল ব্যাসদেব, শুকদেব গোস্বামী এবং গুরু পরম্পরায় অপরাপর আচার্য্যবৃন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পৃথিবীর সব লোকের মহিমা ও জয়গান করা উচিত। এই প্রক্রিয়া খুবই সহজ। শুধুমাত্র মহামন্ত্র, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে, জপলেই চলবে।

২. হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ সমস্ত বিশ্বের জন্যই প্রযোজ্য

মানুষের মাঝে ভগবৎ প্রেম বিস্তারের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ প্রবর্তন করেন। কলিযুগের ধর্ম নাম সংকীর্তন হলেও সব যুগের জন্যই এই নাম সমানভাবে প্রযোজ্য। সবযুগেই এমন অনেক ভক্ত ছিলেন যারা এই নাম জপ করে সাধন-ভজনের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হন। এই মহামন্ত্র কেবলমাত্র এক যুগ, অথবা এক দেশের বা এক শ্রেণীর লোকের জন্য নয়। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যে কোন সমাজের যে কোন অবস্থানে থেকে যে কোন বয়সে জপ করতে পারেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ হলেন সব যুগের সব দেশের এবং সব লোকের পরমেশ্বর ভগবান।

৩. সমস্ত পৃথিবীর জন্য এক মন্ত্র—তা হল 'মহামন্ত্র'

বর্তমান যুগে মানুষ চায় এক ধর্মগ্রন্থ, এক ঈশ্বর, এক ধর্ম এবং এক পেশা। তাই সব পৃথিবীর জন্য একটি সর্বজন গ্রাহ্য ধর্মগ্রন্থ হোক– ভগবদ্‌গীতা। আবার সমস্ত বিশ্বের জন্য একজন ঈশ্বরই থাক– শ্রীকৃষ্ণ। একটি মন্ত্রই থাক না কেন– হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। আর সবার জন্য একটিমাত্র কর্ম হোক– পরমেশ্বর ভগবানের সেবা।

৪. পবিত্র নাম সবার জন্যই লভ্য

পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম এমনই শক্তিশালী যে তা বোবাকেও রক্ষা করে, যে কিনা জপ করতে অক্ষম। সবার জন্যই এই মহামন্ত্র সহজেই লভ্য। এমনকি চণ্ডালের মতো সর্বনিম্নস্তরের মানুষও এই মহামন্ত্র জপে মুক্তিলাভ করতে পারে। (শ্রীল রূপ গোস্বামীকৃত পদ্যাবলী)।

৫. তিন ধরনের মানুষ– যারা মুক্ত, যারা মুক্তির জন্য সচেষ্ট এবং যারা ইন্দ্রিয়ের অধীনস্থ এরা সবাই ভগবানের পবিত্র নাম জপ করে আনন্দ লাভ করতে পারে :

জড় জগতে তিন ধরনের মানুষ আছে। একদল আছেন, যারা মুক্ত। আর একদল আছেন, যারা মুক্তির জন্য চেষ্টা করছে। অন্য একদল আছেন, যারা জড় জাগতিক ভোগেই লিপ্ত। এদের মধ্যে যারা মুক্ত তারা জানেন যে ভগবানের প্রীতি লাভের জন্য একমাত্র উপায় হলো—তাঁর পবিত্র নাম জপ করে চিন্ময় স্তরে অবস্থান করা। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা যারা মুক্ত হতে চান। এই মুক্তির জন্যও ভগবানের পবিত্র নাম জপ এবং শ্রবণ করা তাদের কর্তব্য। এই করে তারাও চিন্ময় আনন্দ লাভ করতে পারবেন। যারা সাধারণকর্মী– অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর লোক তারা ইন্দ্রিয়ের ভোগ-লালসায় লিপ্ত থাকে। তারাও ভগবানের লীলা শ্রবণ করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। যেমন, তারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবানের ভূমিকা, বিভিন্ন দানব সংহার, গোপীদের সাথে ভগবানের বৃন্দাবন লীলা ইত্যাদি শ্রবণ করে, এই শ্রেণীর লোকেরাও অপার আনন্দ পেতে পারে। এভাবে মুমূক্ষু, বিমুমূক্ষু এবং কর্মী– এই তিন শ্রেণীর লোকেরই ভগবানের মহিমার কথা শ্রবণ ও জপ করা উচিত। এতে সবারই মঙ্গল হতে পারে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতম্-এর অষ্টম স্কন্দের তৃতীয় অধ্যায়ের বিংশতম শ্লোকে বলা হয়েছে, শুদ্ধ ভক্ত (মুক্ত) যাদের কোন জড় জাগতিক কামনা নেই তাঁরা ভগবানের পাদপদ্মে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন। পবিত্র নাম শ্রবণ ও জপ করে তারা ভগবানের করুণা সাগরে নিমজ্জিত হয়। মুমূক্ষু অর্থাৎ মুক্ত হতে চায়—তারা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির উপর নির্ভর করে না। এর পরিবর্তে মুক্তির জন্য তারা ভগবানের পবিত্র নাম জপের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়। সকাম কর্মীরা বেশির ভাগ সময়েই তাদের কর্ম এবং হৃদয়ে আনন্দ দানকারী বিষয়গুলোর উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। অবশ্য তারাও কোন কোন সময় ভগবানের নাম জপ এবং তাঁর মহিমা শ্রবণ করতে পছন্দ করে। প্রকৃত ভক্তরা সবসময় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভগবানের নাম শ্রবণ ও জপ এবং তাঁর লীলাস্মরণ করে।

ভগবানের পবিত্র নাম সমগ্র মানব সমাজকে উপকৃত করে

১. নাম সংকীর্তন মানুষকে ভগবৎ অনুভূতি লাভে উদ্বুদ্ধ করে, শান্তি ও হৃদ্যতা সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারে :

শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন পুরীতে সংকীর্তন করতেন, তখন বহুলোকের সমাগম হতো। তারা মহাপ্রভুর সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করে অপার আনন্দ লাভ করতেন। তারা মহাপ্রভুর কৃপায় নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে যান। সবাই একে অপরের বন্ধু হয়ে পড়েন। এভাবে বহুলোকের সমন্বয়ে নাম সংকীর্তন যজ্ঞ আরম্ভ হলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শান্তি আসতে পারে। কারণ এই সংকীর্তন বিভিন্ন দেশের লোকদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টিতে সক্ষম।

প্রভুপাদ পত্রাবলী

সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী বিরচিত অনুবাদক ঃ প্রাণেশ্বর চৈতন্য দাস (প্রণব)

পূর্ব প্রকাশিতের পর

আমার প্রিয় গর্গ মুনি,

আমি বিশেভাবে চিন্তিত এই জন্য যে ডিক্টাফোনটির ফিতা আটকে গেছে। তবে তুমি পরিবেশককে জিজ্ঞাসা করবে, কেন ২৫ থেকে ৩০ মাত্রায় এসেই ফিতাটি জড়িয়ে যাচ্ছে। আমাকে জানাবে এই সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করা যায়। বর্তমানে আমার কাছে একটিমাত্র টেপ রয়েছে এবং অন্য আরেকটি টেপ ঠিক আছে কিনা আমাকে অবশ্যই জানাবে। তোমার কাছ থেকে সবিশেষ অবগত হলে খুবই খুশী হব।

আমার প্রিয় যদুরাণী,

যদি কীর্ত্তনানন্দ মন্ত্রিয়েলে যান, তাহলে তুমি তাঁকে একটি বিষ্ণু ছবি দিও। আশা করি তুমি বিষ্ণুনামগুলি, যা আমি পাঠিয়েছিলাম তা পেয়েছ অবশ্যই।

তোমাদের স্নেহধন্য
এসি, ভক্তিবেদান্ত স্বামী

আমার প্রিয় রায়রামা,

তুমি অবশ্যই মি. লিও প্যাসটানটিনের সাথে যোগাযোগ রাখবে। একজন ভারতীয় যিনি এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, গত পাঁচ বছর ধরে। তিনি আমাকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এখানে আমার যে সমস্ত ছাত্র এবং শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছে তাঁরা যদি ভিসা ডিপার্টমেন্টে আমার ভিসা যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় সেজন্য আবেদন করে, তাহলে অবশ্যই ভিসা পাওয়া সহজ হবে, যেটা দীর্ঘস্থায়ীভাবে বসবাদের ভিসা। এছাড়া অন্য অনেক সংস্থা এবং ছাত্র ও শুভাকাঙ্ক্ষীরাও বিভিন্নপত্র পত্রিকায় প্রশস্তি করেছেন আমার সম্পর্কে। আমার ভিসার যে নির্দিষ্ট সময়কাল আছে তার পূর্বেই কেন আমরা এসব পদ্ধতি গ্রহণ করছি না। তুমি মি. পাসন্টানটিন এর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করবে এবং তাঁর মতামত নেবেন। তাঁকে আমার বিভিন্ন প্রকাশিত লেখা দেখাবে।]

তোমাদের—এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী।
সান ফ্রানসিসকো
১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭

আমার প্রিয় ব্রহ্মানন্দ,

আমার আশীর্বাদ নিও। পক্ষান্তরে অন্যসব গুরুভ্রাতা ও মাতাজীদেরকে আমার আশীর্বাদ জানিও। তোমার সাথে গত রাত্রে টেলিফোনে যে কথাবার্তা হয়েছে, তাছাড়া তোমার প্রেরিত ১০ই ফেব্রুয়ারির যে চিঠি রয়েছে, সেই মোতাবেক তোমাকে জানাচ্ছি যে, সানফ্রান্সসিস্কোর শাখাটি সম্পূর্ণ আলাদাভাবে কাজ করবে, সেজন্য নিউইয়র্ক শাখাটির কোন রকম দায়দায়িত্ব নিতে হবে না। আমি ইতিপূর্বে মি. আলটম্যান-এর পত্র পেয়েছি এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। তুমি ২০০ শত ডলার মি. আলটম্যান এর নামে তাছাড়া ৬০০০ হাজার ডলার সর্বমোট ৬২০০ ডলার আমার সেভিংস একাউন্ট নং ১৯২৮২ তে ট্রেড ব্যাংক এবং ট্রাস্ট কোম্পানী তে প্রেরণ করবে।

প্রত্যাপন করা পত্রটি এর সাথে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমি এই প্রত্যাপর্ন পত্রটিতে স্বাক্ষর করেছি, তুমিও তাতে স্বাক্ষর করে ব্যাঙ্কে পাঠাবে। সেই অনুযায়ী ব্যাংক কাজ করবে। যখনই বাড়ি ক্রয় এর যাবতীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত হবে, তখনই ব্যাংক আমার ৬০০০ হাজার ডলার এর চেকটি তারা প্রাপ্ত হবে। আর যতক্ষণ এই সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম চূড়ান্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ সেটি আমার সেভিংস এ্যাকাউন্টেই থেকে যাবে।

যখন ক্রয় সংক্রান্ত কাজ স্বাক্ষরিত হবে তখন আমি সানফ্রানসিসকো ব্যাংকে ১০০০ হাজার ডলার পরিশোধ করার জন্য নির্দেশ করবো এবং অবশিষ্টাংশ পরে প্রদান করতে বলবো।

শিষ্য ও ট্রাষ্টিদের নির্দেশে ১০০০ হাজার ডলার ইতিমধ্যে কোন রকম বোঝাপড়া ছাড়াই প্রদান করা হয়েছে। আমি জানি তুমি তোমার সাধ্যমত সবকিছু করে যাচ্ছ, তা সত্ত্বেও কিছু কিছু ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। আমি তোমার প্রতি মোটেই অখুশী নই। তবে শুনছি যে, মি. পাইন কোনভাবেই অন্য উৎস থেকে কোন রকম অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন না। তিনি বিভিন্ন কৌশলে শুধু সময়ের অপচয় করছেন ও দীর্ঘ সূত্রীতা প্রকাশ করছেন। সুতরাং তুমি তাঁকে তার প্রাপ্য ছাড়া আর একটি টাকাও প্রদান করবে না। যদি সে টাকা চায় তাহলে তুমি তাঁকে সরাসরি অস্বীকার করবে।

নিউইয়র্কে কীর্ত্তনানন্দের উপস্থিতি বিশেষ প্রয়োজন। সেজন্য তার মন্ত্রিয়েল যাত্রা আমি বাতিল করতে বলেছি। আমার বন্ধুদের বিশেষ উপদেশ হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেক শাখা স্থাপন করা আমাদের জন্য খুব কঠিন একটি কাজ। আমাদের পক্ষে বর্তমানে যে দু'জায়গায় মন্দির রয়েছে সেটা নিয়ে আমাদের ওৎপ্রোত থাকতে হবে। তাছাড়া মন্ত্রিয়েল শাখাটির জন্য টাকা ও ভক্ত প্রয়োজন কিন্তু তা আমরা প্রয়োজন মতো সরবরাহ করতে পারছি না।

ডিকটাফোনে তুমি যে নোট প্রদান করেছ তা আমি সাবধানতার সাথে নিয়েছি। এটা পাঠিয়েছি এইজন্য যে মেশিনটার কিছু ত্রুটি রয়েছে। তার ইতিমধ্যে তারা আমাকে অন্য একটি মেশিন দিয়েছেন। এখন আমার কাছে পাঁচটি টেপ রয়েছে। তবে আরো প্রয়োজন। নীল এখনও এখানে আসেনি। 'হরে কৃষ্ণ' মন্ত্র জপ কর ও আনন্দে থাক। আমরা সকলেই কৃষ্ণের কৃপায় কুশলেই রয়েছি।

তোমাদের চির শুভাকাঙ্ক্ষী—এ, সি, ভক্তিবেদান্ত স্বামী

(চলবে)

উপদেশে উপাখ্যান

কে চোর

গোকুলে শিশু কৃষ্ণ একজনের বাড়িতে ঢুকে ননী খেতে থাকে। কৃষ্ণের সখারাও ননী খাচ্ছিল। শিকা থেকে ননীহাঁড়ি নিচে নামানো হয়েছিল। ওই ঘরে ছিলেন এক মাতাজী। তিনি ঘটনাটি লক্ষ্য করলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে সব সখা পালিয়ে গেল। মাতাজী তখন কৃষ্ণকে আঁটসাঁট করে ধরলেন। মাতাজী কৃষ্ণকে বললেন, 'তুই পাকা চোর। তোর মা সেকথা বিশ্বাসই করে না। আজ আমি তোকে এক্ষুণি যশোদার কাছে নিয়ে যাই, তবে মজা দেখবি।'

কৃষ্ণ বলে, 'আমি মোটেই চোর নই। আমি আমার জিনিস খাচ্ছি। তাই মা কেন আমার ওপর রাগ করবে। আমাকে কেন চোর বলো।'

মাতাজী বললেন, 'তুই রোজ রোজ চুরি করছিস আর তোকে চোর বলব না তো, কাকে বলব। তুই আরো আমার সামনে সাহস দেখিয়ে বলছিস। তুই এমন পাকা। তোকে এক্ষুণি মজা দেখাবো। চল।

মাতাজী তখন কৃষ্ণকে ভালো করে ধরে সোজা যশোদা ভবনের দিকে চললেন। যশোদার বাড়ির কাছে হাঁক ডাক দিতে লাগলেন, "যশোদা, যশোদা"।

মা যশোদা বেরিয়ে এলেন। মাতাজী বললেন, তুমি তো বিশ্বাস করো না পাকা চোরের কথা। তাই নিজের হাতে নাতে ধরেই তোমার কাছে নিয়ে এসেছি চোরকে।

যশোদাদেবী বললেন, এই দুপুরের গরমে বুঝি তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। ছোট বাচ্চাটিকে ধরে নিয়ে এসে কি সব চোর চোর করছ। বাচ্চাটার ঘুম পেয়েছে, তাই চোখ কচলাচ্ছে দ্যাখো।

মাতাজী তার নিজের শিশুপুত্রকেই ধরে নিয়ে এসেছে। কৃষ্ণকে নয়। আরও দেখা গেল যে, যশোদা মা তাঁর পুত্র কৃষ্ণকে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন, সে এখনও ঘুমোচ্ছে।

মাতাজী তখন হতভম্ব হয়ে বলতে লাগলেন, 'কি জানি, আমার মাথা খারাপ কিভাবে হলো!' এই বলে মাতাজী তার পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। ঘরে ফিরে এসে চিন্তা করতে লাগলেন, কে আমার পুত্র, কে যশোদার পুত্র।

হিতোপদেশ

কৃষ্ণ সেই মাতাজীকে জানিয়ে ছিলেন যে, ঘরটি কৃষ্ণের এবং ননীও কৃষ্ণের। তাই তাঁকে চোর বলা ঠিক হবে না। এটি সত্য কথা। কিন্তু মাতাজী কৃষ্ণকে চোর বলে প্রমাণ করতে চাইছিলেন। যার ফলে অযথা নিজের শিশুপুত্রকেই চোর বললেন এবং মা যশোদার কাছে নিজের মাথাটাও খারাপ হয়েছে এই বলে পালিয়ে এলেন। কৃষ্ণ সবারই।

নিচে পড়ো না

বহুদিন আগেকার কথা। একজন লোক বঙ্গোপসাগরে নৌকায় চড়েছিল। হঠাৎ নৌকাডুবি হওয়ায় মাঝি একদিকে সে একদিকে সাঁতার দিয়ে কিনারায় ওঠার চেষ্টা করেছিল। সেই অদক্ষ মাঝিকে লোকটি আর খুঁজে পায় নি। তখন বেলা ডুবুডুবু। কাছাকাছি কোনো লোক বসতি নেই। পথ ঘাটেরও কোনো চিহ্ন নেই। সুন্দরবন এলাকা। গভীর বন। অন্ধকার হয়ে আসে। বন্যজন্তুর ডাক শোনা গেল। লোকটি খুব ভয় পেল। মারাত্মক জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে চিন্তা করতে লাগল।

কোমরের গামছাটি কষে নিয়ে সে একটি বিশাল লম্বা গাছের উপরে উঠতে লাগল। উঁচু শাখায় বসে কোমরের গামছাটি দিয়ে গাছের সঙ্গে নিজেকে ভালো করে বেঁধে রাখল, যাতে কোনো প্রকারে সে নিচে না পড়ে যায়। নিচের দিকে তাকাতেই দেখল দুটি বড় বড় চোখ জ্বলছে। বুঝতে পারল বাঘ এসে বসে রয়েছে।

বাঘ চিন্তা করতে লাগল লোকটি নিচে পড়লেই ধরে খাব। লোকটি চিন্তা করতে লাগল আগামী কাল সকাল পর্যন্ত এভাবে সাবধানে গাছের উপরেই জেগে থাকতে হবে। এভাবে রাত কাটল।

পরদিন সকালবেলায় সে কতকগুলো নৌকা দেখতে পেল। নৌকার মাঝিদের খুব জোরে ডাকতে লাগল। মাঝিরা লাঠি নিয়ে সেখানে এসে তাকে বলল, আর ভয় নেই নিচে নেমে এস। লোকটি নেমে এলে মাঝিরা তাকে নৌকায় করে তার গন্তব্য স্থলে পৌছিয়ে দিল।

হিতোপদেশ

চলার পথে নানা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। তাই সাবধান সচেতন থাকতে হয়। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে থাকতে হয়। ভক্তি অবলম্বন করতে হয়। ভক্তিবিচ্যুত হলেই বিভীষিকাপূর্ণ জন্ম-মৃত্যুর মায়াচক্রে পড়তে হয়। যারা কৃষ্ণচেতনাময় তারা সময় মতো দুঃখময় সংসার উত্তীর্ণ হয়।

ছোটদের শ্রীল প্রভুপাদ

তিনি প্রতি সন্ধ্যায় ভগবানের আরতি করতেন। দর্শকরা সানন্দে অনুষ্ঠানটিকে 'ঘন্টাধ্বনি' বলতো।

ধীরে ধীরে স্বামীজি তার প্রাথমিক দর্শকদের সঙ্গে ভগবান কৃষ্ণ ও ভারতীয় কৃষ্টির পরিচয় করিয়ে দিলেন।

দর্শকদের কাছে ভগবান কৃষ্ণে শরণাগতি ছিল কিছু আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

নানা উৎসবে তারা এখন সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করল। হাওয়ার্ড, ওয়ালি ও অন্যান্যরা ঘরটিকে বিরাট বিরাট ভারতীয় চিত্র, বিজ্ঞাপন ও ধূপবাতী দিয়ে সাজাল।
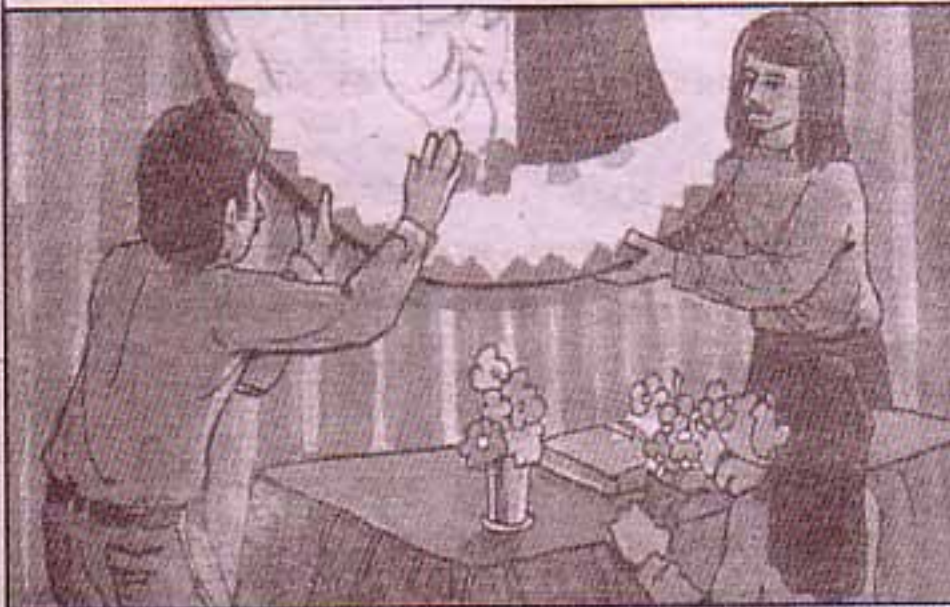
স্বামীজি ঘরে প্রবেশ করলে, তারা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল।

এইটি হচ্ছে পাশ্চাত্য দেশে তার প্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠা। রবিবার দিন স্বামীজি রান্না করে স্বয়ং সকলকে প্রসাদ বিতরণ করতেন। ভজন ও হরিনাম কীর্তন হোত। সন্ধ্যাবেলা ঘরটি এক অন্তরঙ্গ উপাসনা স্থলে পরিণত হোত।
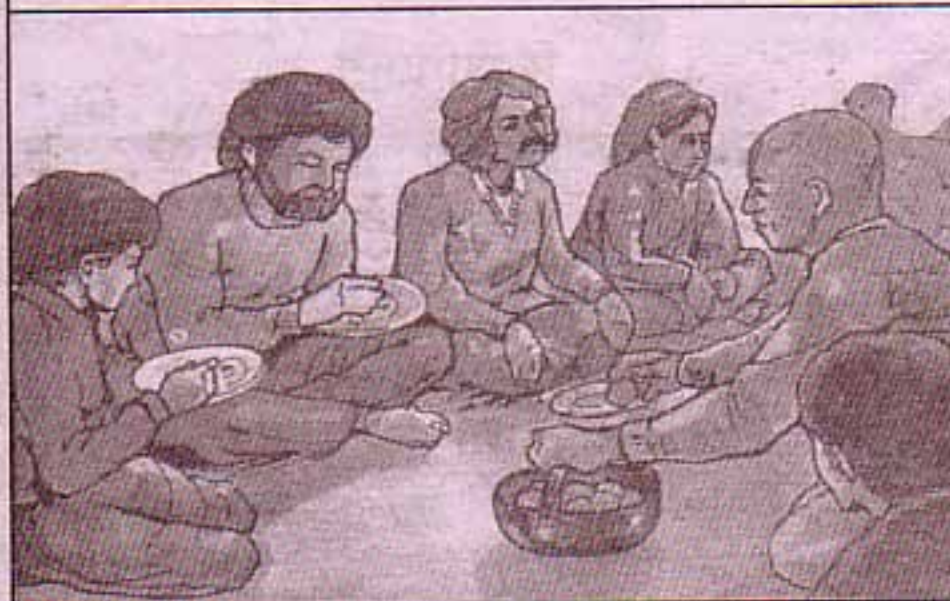
তার সাক্ষাৎকারীরাও এখন পারমার্থিক উন্নতি করতে লাগল। একজন তাঁর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, ...উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে বলে স্বামীজি মনে করলেন।
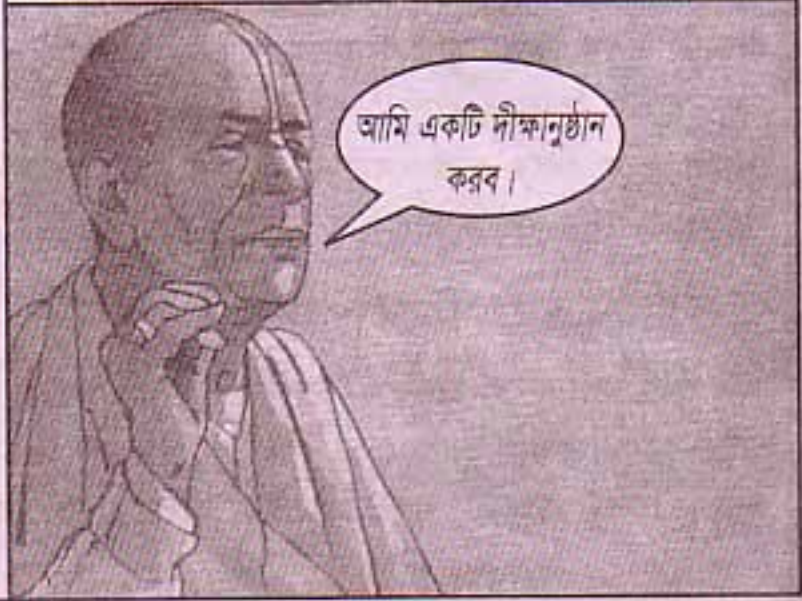
এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্য, হরিনাম মন্ত্রের সময় ১০৮ টি পুঁথি সমন্বিত মালা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন।

১৯৬৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ছিল জন্মাষ্টমির আগে দীক্ষার দিন—যেন প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তরে....

অবশেষে দীক্ষানুষ্ঠানের দিন প্রতিটি মালা এক ফের জপ করে তিনি দীক্ষিত শিষ্যকে দান করলেন।
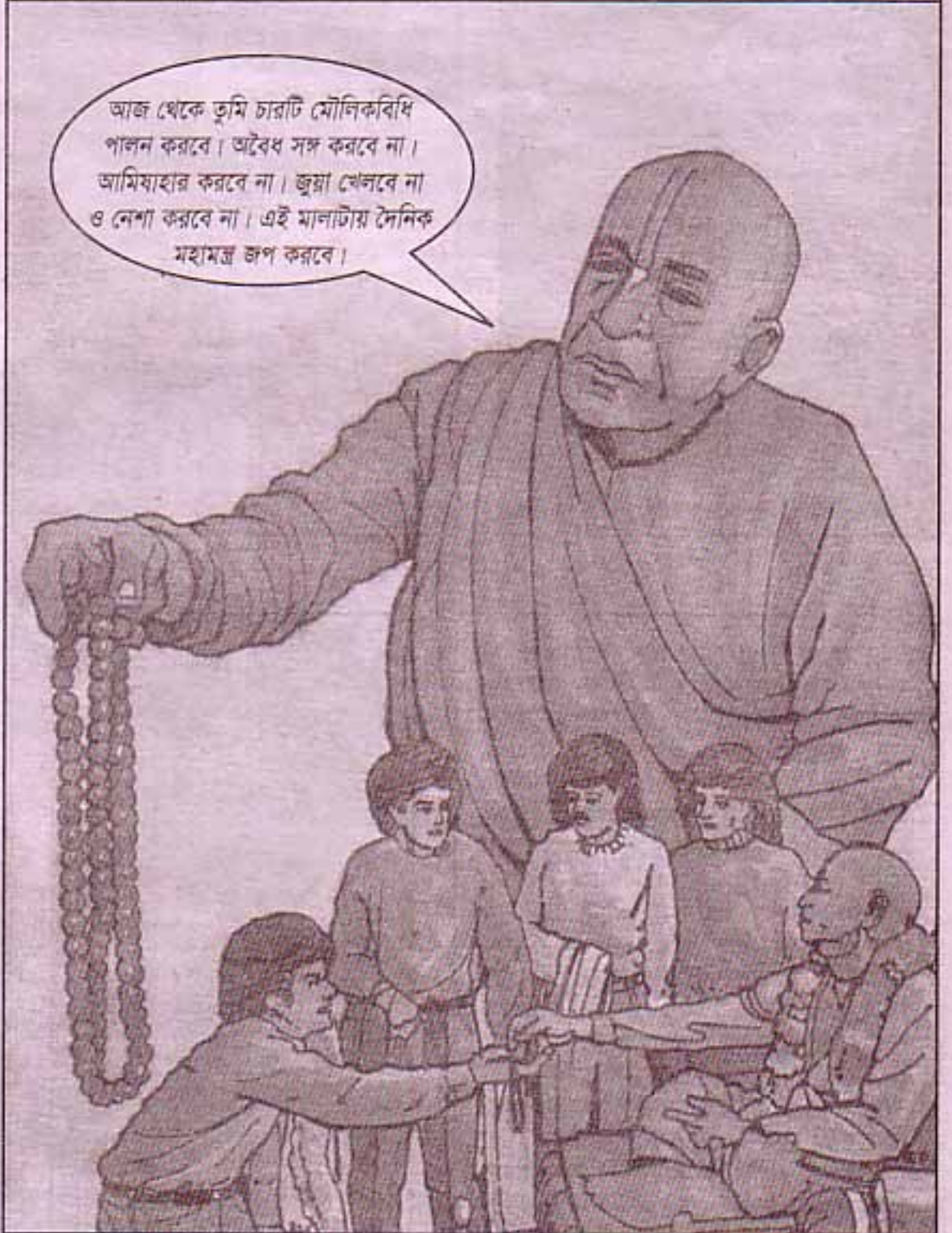
১১ জন দীক্ষা গ্রহণ করল। অবিরাম হরিনাম মহামন্ত্র কীর্তনের মধ্যে বৈদিক রীতি অনুযায়ী স্বামী একটি হোম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। তারাই স্বামীজির প্রথম আমেরিকান শিষ্য হওয়ার কথা। আজ থেকে এই প্রথম চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী আমেরিকানরা প্রচার করবে।

মুকুন্দ ও জানকী ছিল স্বামীজির প্রবীন উচ্চ পদাধিকারী শিষ্য ও শিষ্যা। তারা সানফ্রানসিসকোতে গিয়ে 'হাইট' অ্যাসবেরী'তে এক পরিত্যক্ত দোকান ঘর ভাড়া নেয়। ঘরটি মন্দিরে পরিণত করে। তাদের নেতৃত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্বামীজিকে সেখানে তারা আসতে অনুরোধ করে।

১৯৬৭ সালে ১৬ই জানুয়ারী স্বামীজি তাই সানফ্রানসিসকো শহরে উপস্থিত হন। সাংবাদিকরা তার সংঘ সম্পর্কে জানবার জন্য আরো আগ্রহী হয়ে উঠল। 'হরেকৃষ্ণ ভক্ত সমাজের' কথা দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে কবি ও গায়ক এলেন গিন্সবার্গ ও অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে মুকুন্দ অ্যাভলন নাচঘরে এক হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করে। আধুনিক গায়ক ও নর্তকরাও (ROCK BANDS) এতে অংশগ্রহণ করে। স্বামীজি ভাষণ দিলেন, হরিনাম মহামন্ত্র কীর্তন করলেন। তার সঙ্গে ব্যান্ড বাজান হল। হাজার হাজার লোক AVALON নাচঘরে সমবেত হয়েছিল। বাঁশী, বাদ্যযন্ত্র, গীটার ও নানা রকম বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। জিন্, জ্যাকেট, বুটজুতো পরে ভবঘুরে, উদভ্রান্ত যুবক-যুবতীরা এসেছিল। জার্মান শিরস্ত্রাণ, নানা রকম ব্যাজ পরে, ধূমপান করতে করতে বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে তারা এল ; শুধু তাদের মটর সাইকেলটা ছাড়া তারা তাদের অদ্ভুত সবকিছুই সঙ্গে এনেছিল। স্বামীজি উঠে দাঁড়ালেন। দু'বাহু তুলে তিনি নৃত্য করতে লাগলেন।

স্বামীজি তার সঙ্গে যোগদান করতে সকলকে ইঙ্গিত করলেন। যারা তখনও বসেছিলেন, তারা উঠে দাঁড়াল স্বামীজির নৃত্যের তালে তালে তারা নাচতে লাগল: স্বামীজির সঙ্গে সঙ্গে তারাও কীর্তন গান করতে লাগল।

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ পূর্বে উগ্র মাদক দ্রব্য ও অন্যান্য নেশায় আসক্ত ছিল। স্বামীজির পূত সান্নিধ্য লাভ করে তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কু-অভ্যাস তারা সহজেই ত্যাগ করল। নতুন আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা হ্যান্ডবিল তৈরী করল।

সব সময় পরমার্থিক চেতন রাজ্যে বাস করুন
আর জড় স্তরে ফিরে আসতে হবে না।
কৃষ্ণচেতনা অনুশীলন করুন
আপনার চেতনাকে সম্প্রসারিত করুন।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ঐ হ্যান্ডবিলে মানসিক চেতনা বিকাশে বিভিন্ন পন্থাগুলির মধ্যে কৃষ্ণ-চেতনা শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। স্বামীজি এইসব মাদকাসক্ত যুব সমাজের মধ্যে ছিলেন। তারা মাদক ও অন্যান্য পন্থায় তাদের মানসিক চেতনা পরিবর্তনের চেষ্টা করছিল। এইসব প্রচারপত্রের মাধ্যমে স্বামীজির শিষ্যরা বিপথগামী যুবকদের কাছে কৃষ্ণভাবনা প্রচার করছিল। এইটিই তাদের প্রচারের প্রথম পর্ব।

আরো বহু লোকের কাছে প্রচারে উদ্দেশ্যে তিনি শিষ্যদের টমকিন স্কোয়ার নিয়ে গেলেন। উন্মুক্ত পরিবেশে তিনি শিষ্যদের নিয়ে কীর্তন করলেন। সমবেত ব্যক্তিদের কাছে তিনি হরিকথা বললেন।

উদ্ভ্রান্ত, পরমার্থলিপ্সু, ভবঘুরে, উৎকট নেশায় আসক্ত ও আধুনিক যন্ত্র সংগীত চালকরা সকলেই স্বামীজির সঙ্গে মহামন্ত্র কীর্তনে যোগ দিল।

ঐ পার্কে নিয়মিত কীর্তন শুরু হল। খবরের কাগজে যাকে 'হরেকৃষ্ণ আন্দোলন' বলতো তা জনপ্রিয় হয়ে উঠল।
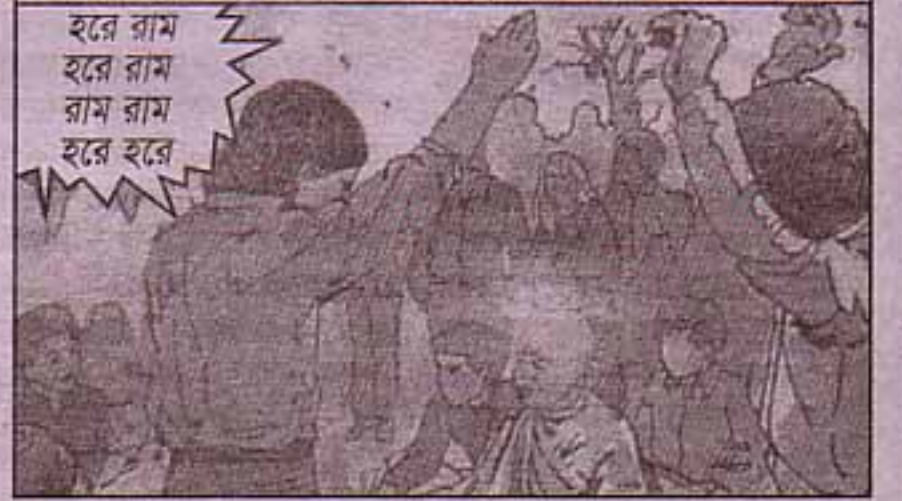
অলাভজনক ধর্মীয় সংস্থারূপে সংঘটি নথিভুক্ত করবার সময় তার কিছু পুরোন শিষ্যকে সংঘের তত্ত্বাবধায়ক হতে নির্দেশ দেন।

দিনের বেলা স্বামীজি ভগবৎ কথা প্রচার করতেন আর রাত্রে তিনি কয়েক ঘন্টা ঘুমতেন মাত্র। প্রতিদিন খুব সকালে উঠে তিনি হরিনামের মালা জপ করতেন। তারপর তিনি বৈদিক শাস্ত্র ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করতেন।

আদর্শ গৃহস্থ জীবন লাভের উপায়

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছে
কিভাবে গৃহে থেকে আদর্শ গৃহস্থ জীবন লাভ করতে পারেন

কারা শাস্ত্র কথা শোনে না

সুবল দাস প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা মহাবল প্রভু, আমরা যখন লোকদেরকে বলি যে, 'মনুষ্য জীবনের মেয়াদ মাত্র কয়টি বছরের জন্য। হরিনাম করাই যুগধর্ম। কলির চারটি পাপকর্ম এড়িয়ে নাম গ্রহণ করে বৈকুণ্ঠ গতি লাভ করাই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা। দয়া করে আমিষ আহার, নেশা ভাঙ, জুয়া লটারী, অবৈধ মেলামেশা বর্জন করুন। আর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করুন।' কিন্তু বেশির ভাগই দেখা যায় এসব কথায় লোকেরা উদাসীন হয়ে থাকে।

মহাবল দাস প্রশ্ন করলেন–লোকেরা হরিনাম করছে না?

– না।

– চারটি নিয়ম পালন করছে না?

– না।

– হয় তাদের মতো করে বোঝাতে পারো না, নতুবা তারা বুঝতেই আগ্রহী নয়।

সুবল দাস নীরব ছিলেন। মহাবল দাস বলতে লাগলেন–মহর্ষি ব্যাসদেব মহাভারতের শান্তিপর্বে ২৪৬ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, দশরকমের মানুষ বৈদিক শাস্ত্র কথা শুনতে বা মানতে আগ্রহী নয়।

সুবল দাস বললেন–যেমন?

মহাবল দাস বললেন– ১) অপ্রশান্ত, ২) অজিতেন্দ্রিয়, ৩) তপস্যাবিমুখ, ৪) বেদবিহীন, ৫) অবশীভূত, ৬) অসূয়াপরতন্ত্র, ৭) অসরল, ৮) যথেচ্ছচারী, ৯) প্রতিকূল তর্কপরায়ণ ও ১০) কুটিল। বুঝলে?

– না।

– প্রশান্ত মানে হলো প্রকৃষ্ট সুখ নিয়ে যারা রয়েছে। অনিত্য জড় জাগতিক নিকৃষ্ট বস্তুকেই সুখ সম্ভোগের বিষয় বলে যারা মনে করে, তারা 'অপ্রশান্ত'। তারা বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় না। তারপর 'অজিতেন্দ্রিয়' বলতে যারা জড় জগতের রূপ রসের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট। 'তপস্যা বিমুখ' বলতে যারা কারো কথা সহ্য করতে পারে না, আরামপ্রিয়ও কোনো কষ্ট সহ্য করতে চায় না। 'বেদবিহীন' বলতে যারা নিষিদ্ধ কর্মে আকৃষ্ট, বৈদিক শিক্ষায় অভ্যস্ত নেই। 'অবশীভূত' বলতে যারা নিজেকে স্বাধীন ও অতি চালাক বলে মনে করে। 'অসূয়াপরতন্ত্র' বলতে যারা অন্যের গুণ দেখতে পারে না, গুণের মধ্যে দোষ আরোপ করতে, অন্যের সৌভাগ্যে বা উন্নতিতে দ্বেষ বা হিংসা করাই যাদের স্বভাব। 'অসরল' বলতে পেঁচালো ধরনের স্বভাব। 'যথেচ্ছচারী' বলতে যারা আজকে কারো কথা মতো চলল, ঠিক পরক্ষণেই অন্য একজন যা নির্দেশ দিল সেটি ভালো মন্দ বিচার না করেই সেইমতো চলতে লাগল। এইরকম ব্যক্তি যখন যা ইচ্ছা সেই মতোই আচরণ করে, যখন যা শুনবে সবগুলোতেই সে সায় দিয়ে যাবে, কিন্তু কর্তব্য অকর্তব্য নির্বাচন করে না। 'প্রতিকূল-তর্কপরায়ণ' বলতে যখনই সে শাস্ত্র কথা শুনবে অমনই তার বিরুদ্ধচারী কোনো চরিত্রের কথা সে চিন্তা করতে থাকবে, যাতে সেও শাস্ত্র-নির্দেশের বিপক্ষে থাকাটা ঠিক বলে জাহির করে। 'কুটিল' বলতে যারা কপট। কোনও বিধি নিষেধ মানে না, অথচ সে লোককে দেখাতে চাইবে যে, সে অত্যন্ত বিধিপালনপর নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। এই ধরনের বদ মানুষেরা কোনোদিন ভক্ত হতে চাইবে না, বৈদিক শাস্ত্র কথার প্রতি উদাসীন থাকবে।

কাউকে হেয় বা নিন্দা করো না

সুবল দাস বললেন, মহাবল প্রভু নাকাশী পাড়াতে আমি গিয়েছিলাম, সেখানে একজন ব্রহ্মচারী গেরুয়া বসন পরা অল্পবয়সী সাধুকে দেখলাম, সে পথ ধরে হরিনাম জপ করতে করতে যাচ্ছিল। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে পথের ধারে একজন লোক বলছে, "গৃহ সংসার ধর্মই বড় ধর্ম, আর কোন ধর্ম নেই।"

– তারপর?

– ব্রহ্মচারী আপন মনে হরিনাম করতে করতে চলে গেল। সে কোনও কথারই উত্তর দেয় নি।

– যে লোকটি গৃহসংসার বড় ধর্ম বলছিল, সে বিবাহিত কিনা?

– হ্যাঁ, তার বউ ও ছেলেপিলে তো রয়েছে।

মহাবল দাস বললেন, পাগলের কথায় উত্তর দেওয়ার আবশ্যকতা নেই, এই জ্ঞানে ব্রহ্মচারী তার কোনো উত্তর দেয় নি। পাগলের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করা উচিত নয়, সেই জন্য হরিনাম জপ সে বন্ধ করে নি।

সুবল দাস–হ্যাঁ আমি তা বুঝেছি, কিন্তু ওই লোকটিকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, আপনার গৃহসংসার ধর্ম বড় না ছোট, সেটি কি করে বুঝলেন।

– লোকটি আমার কথার উপর বলল, আগে ভোগ তারপরে ত্যাগ। আগে ত্যাগী বৈরাগী হয়ে ভোগচিন্তা করলে, ভণ্ড হয়ে যায়, সেটি আমি জানি।

– তারপর?

– আমি বললাম, মশাই আপনি ভোগ সুখেই মজে থাকুন, তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু ওই ব্যক্তিটি কি ভোগ চিন্তা করছে, কি কৃষ্ণচিন্তা করছে, সেটি আপনি দেখেছেন কি? সে তো নিজমনে কৃষ্ণনাম জপ করছে!

– তারপর?

– লোকটি একটু নরম সুরে বলল, মানে আমি একটু মজা করে বলছিলাম। সাধারণত ভণ্ডরাই নামটাম করে ঘুরে বেড়ায়, তাই ...

– তারপর?

আমি রেগে গিয়ে তাকে বকতে লাগলাম, আপনি লোককে খামোকা ভণ্ড জ্ঞান করতে থাকেন, কিন্তু আপনি বা অত কি এমন সাধু হয়ে গেছেন যে ভক্তের ভক্তির বিচার করছেন।

– তারপর?

– সে তখন আমাকে বলছে, আমি ওই সাধুকে যদি কিছু বলে থাকি, তবে আপনার গা এত জ্বলে কেন?

– তারপর?

– আমি বললাম, আমি ওই ব্রহ্মচারীকে চিনি, যে ও কিভাবে সাধন ভজন করছে। আপনি তাকে চেনেন না, কেবল আপনার বাড়ির সামনের পথ দিয়ে যাচ্ছে বলেই আপনি তাকে দেখামাত্রই হেয় জ্ঞান করছেন। নিজের গৃহভোগ ধর্মের বড়াই করছেন।

– তারপর?

– এই বলেই আমি চলে এসেছি, আর তার কোনো কথা শোনার অপেক্ষা করি নি।

মহাবল দাস বললেন, গৃহস্থ যত বড় ধার্মিক হোক না কেন যদি সে ভজনপরায়ণ ব্রহ্মচারীর নিন্দা সূচক কিছু বলে, অমনি তার অপরাধ সঞ্চিত হয়, সেজন্য নিন্দুককে কুম্ভীপাক নামক নরক বিভাগে যাতনা ভোগ করতে হয়।

আপনাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর

প্রশ্ন ১। কলিযুগে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করলেই কি ভগবানকে দর্শন করা যায়?

– সুতপা মালাকার, কালিয়া, নড়াইল।

উত্তর :

'কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥'

(শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ৭/৭৩)

দশবিধ নাম-অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে শ্রীনাম কীর্তন করলে অসিদ্ধির কোন কিছুই থাকে না। তবে ভগবানকে দর্শন করাই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। এমনভাবে ভগবৎ সেবা করতে হবে যাতে ভগবানই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আমাদেরকে দর্শন করবেন।

প্রশ্ন ২। মহাপ্রভু শচীমাতাকে বলেছিলেন, 'অতি শীঘ্র আমি তোমার কাছে আরও দুইরূপে অবতীর্ণ হব'–কোন দুই রূপ?

– উৎপল মণ্ডল, আসাশুনি, সাতক্ষীরা।

উত্তর :

বিগ্রহরূপে এবং নামরূপে। শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী–

'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।'

(চৈঃ চঃ আদি ৭/২২)

এবং অন্যত্র বলেছেন–

'নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ–তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি–তিন চিদানন্দরূপ॥'

(চৈঃ চঃ মধ্য ৭/১০)

শচীমাতাকে গৌরসুন্দর বলছেন, 'অর্চাবিগ্রহরূপে আমার যে প্রকাশ সেক্ষেত্রে ধরণীরূপে তুমিই আমার মাতা। আর নামরূপে আমার যে অবতার, জিহ্বারূপে তুমিই তার মাতা।'

'মোর অর্চামূর্তি মাতা তুমি সে ধরণী।
জিহ্বারূপা তুমি মাতা নামের জননী॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৭/৪৮)

প্রশ্ন ৩। ভগবানের প্রকৃত সংজ্ঞা কি?

– রূপকুমার বর্মণ, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তর :

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৬/৫/৪৭)

'সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র সৌন্দর্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য–এই ছয়টির সমাহারকে 'ভগ' বলে। এই ছয়টি অচিন্ত্য গুণ যাঁর মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে পূর্ণরূপে রয়েছে, তিনিই ভগবান।' একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই এই ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাই তিনি এবং বিষ্ণুতত্ত্বরূপে তাঁর বিস্তার সমূহই ভগবৎ পদবাচ্য।

প্রশ্ন ৪। সদাচার সম্পন্ন গৃহস্থ-গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়া যায় কি?

–জগন্নাথ সরকার, পার্বত্য চট্টগ্রাম (রাঙামাটি)।

উত্তর :

'কিবা বর্ণী কিবাশ্রমী কিবা বর্ণাশ্রমহীন।
কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা যেই, সে-ই আচার্যপ্রবীণ॥

– (প্রেমবিবর্ত)

গুরু সন্ন্যাসী, না গৃহস্থ–সেটা বড় কথা নয়। সদগুরুপরম্পরা ধারায় আশ্রিত শাস্ত্রীয় আচরণবিধি যুক্ত কৃষ্ণতত্ত্ববিদ কৃষ্ণভক্তের কাছে দীক্ষা নেওয়া যায়। তবে অন্ধ বিশ্বাস কিংবা সন্দিগ্ধ চিত্তে কখনও দীক্ষা নেওয়া উচিত হবে না, তাতে বিপদ বেশি। এছাড়া পরিষ্কারভাবে জানা দরকার যে, সেই গৃহস্থ বৈষ্ণব কোনও যথার্থ সম্প্রদায়ভুক্ত কিনা। চারটি যথার্থ সম্প্রদায় হল : (১) ব্রহ্ম-মধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়, (২) কুমার সম্প্রদায়, (৩) শ্রীসম্প্রদায় এবং (৪) রুদ্র সম্প্রদায়। এছাড়া সব অপসম্প্রদায়।

প্রশ্ন ৫। বিষয়ী ব্যক্তি কি এই সংসারে থেকে কৃষ্ণভজন করতে পারে?

– জগন্নাথ সরকার, পার্বত্য চট্টগ্রাম (রাঙামাটি)।

উত্তর :

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ রয়েছে–
'গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা, নিবেদি চরণে॥'

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫/১০৩)

শ্রীসত্যরাজ খান মহাপ্রভুকে বলছেন–'দয়া করে আজ্ঞা করুন আমার মতো গৃহস্থ বিষয়ী লোকের সাধন ভজন কিরূপে করতে হবে।' তখন–

'প্রভু কহেন–কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন॥'

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫/১০৪)

সুতরাং কৃষ্ণভজনে বিষয়ী অবিষয়ী জাতকুল বিচার অনর্থক। বরং–

'যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত–হীন, ছার।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪/৬৭)

প্রত্যেকেরই কৃষ্ণভজন করা উচিত–এটাই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ। কৃষ্ণভজনাকারীর সমস্ত জড় বিষয়বাসনা ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে যায়। গৃহে থেকেও যিনি কৃষ্ণসেবা করছেন, তাঁকে কখনই বিষয়ী বলা যায় না।

প্রশ্ন-৬। অবৈষ্ণবের মুখে হরিকথা শুনতে নেই কিন্তু পেশাদারী ভাগবত পাঠকের কাছে কৃষ্ণকথা শোনা কি উচিত?

প্রশ্ন-৭। ত্রিতাপ জ্বালা থেকে কিভাবে রেহাই পাওয়া যায়?

– শ্রীমতী রেখারাণী ঘোষ, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।

উত্তর : ১। অবৈষ্ণব বলতে বোঝায় যারা অভক্ত। যারা ভগবানের ভক্ত নয়– ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে না যারা, তারাই অবৈষ্ণব। জ্ঞানীরাও অভক্ত, যোগীরাও অভক্ত, সুতরাং পেশাদারী ভাগবত অর্থাৎ তার গলায় মালা, মাথায় তিলক থাকতে পারে কিন্তু সেও অভক্ত। কেননা সে ভক্তের পর্যায়ে পড়ে না, কেননা ভক্ত কখনই পেশাদারী নয়। যে ভগবদ্ভক্ত সে কখনোই পেশাদারী ভগবদ্ভক্ত হতে পারে না। অবৈষ্ণবের কাছে যেমন ভাগবত কথা শুনতে নেই, তদনুরূপ পেশাদারী ভাগবত পাঠকের মুখেও কৃষ্ণকথা ভাগবত কথা শুনতে নেই। সে সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে–

**অবৈষ্ণব মুখোদ্গীর্ণং পুতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥**

– অর্থাৎ দুগ্ধ অতি পবিত্র বস্তু, যা সেবন করলে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, কিন্তু , ঐ রূপ উৎকৃষ্ট দুগ্ধ সর্পের উচ্ছিষ্ট হলে যেমন তা দুগ্ধের ক্রিয়া না করে বিষেরই ক্রিয়া করে তদ্রূপ পবিত্র হরিকথামৃতপানে জীবের ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হয়, কিন্তু অবৈষ্ণব ব্যক্তির মুখোদ্‌গীর্ণ ভাগবতকথাদি শ্রবণ করলে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় তার দ্বারা জীবের অমঙ্গলই হয়ে থাকে। তা হলে সেই ভগবানের কথাই যা মুক্তি প্রদান করছে তাই আবার বিপজ্জনক যা আমাদের এই জড় জগতে আবদ্ধ করছে। যখনই এ সমস্ত অবৈষ্ণব এবং পেশাদারী ভাগবতদের কাছ থেকে ভাগবততত্ত্ব কথা বা অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থের তত্ত্ব কথা আমরা শ্রবণ করব, তখন আমাদের খুব সাবধান হতে হবে– দেখতে হবে শ্রবণ কার কাছ থেকে করা হচ্ছে। শ্রবণ ছাড়া উপলব্ধি হয় না, তাই সাধু সাবধান। পেশাদারী যে ভাগবত পাঠ তাতে ভগবানের কীর্তন হচ্ছে না, সেটি টাকার কীর্তন হচ্ছে; লোকের মনোরঞ্জনকর হাবভাব দেখিয়ে লোকের মনকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে এবং তার বিনিময়ে কিছু অর্থ কিংবা প্রতিপত্তি লাভ করতে পারে কিন্তু এভাবে জীবের কোনো মঙ্গল হয় না। সেই জন্য শ্রীল রূপ গোস্বামী এক বঙ্গকবির লেখা যখন মহাপ্রভুকে পড়াতে বলেছিলেন তখন ভাগবতাচার্য স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এরপর ভাগবতাচার্য যখন তা অনুমোদন করলেন, তখন তিনি তা পড়লেন এবং যখন দেখলেন ঠিক আছে, তার পরই মহাপ্রভুকে তা পড়তে দিলেন। তার মধ্যেও অনেক রসাভাস ও দোষত্রুটি ছিল; তখন তিনি বললেন–

যাও ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কবি চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণে নিত্য কর সঙ্গ।
তবেত জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্রতরঙ্গ॥
তবে ত পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপলীলা করিয়ে আলিঙ্গন॥

অতএব যার তার কাছে আমাদের ভাগবতপাঠ শ্রবণ করা উচিত নয়; অবৈষ্ণবের কাছে যেমন নয়, তেমনি পেশাদারী ভাগবত পাঠকের কাছেও নয়।

উত্তর : ২। এই জগতে বদ্ধ জীব যারা রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি ত্রিতাপ জ্বালা থেকে মুক্ত। তার নিজের চেষ্টার মাধ্যমে, তথাকথিত কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজেও এই ত্রিতাপজ্বালা থেকে মুক্ত নয়, আবার কাউকেও সে মুক্ত করতে পারে না। এই জগতে একজনকেও নয়। তাই এই ত্রিতাপ জ্বালা কি– তা আমাদের জানতে হবে। এই ত্রিতাপ জ্বালা হচ্ছে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ক্লেশ বা জ্বালা; আধিদৈবিক ক্লেশ হচ্ছে দেবতাদের কাছ থেকে আমরা যে সমস্ত ক্লেশ লাভ করে থাকি; যেমন– খরা, বন্যা, ঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি। তেমনি আধিভৌতিক ক্লেশ হচ্ছে অন্যান্য জীবের কাছ থেকে যে সমস্ত ক্লেশ লাভ করা হয়। যেমন – একজন আরেকজনকে খুন করছে, বা কেউ কুকুরের কামড়ে, সাপের কামড়ে কষ্ট পাচ্ছে বা সব সময় যে-ধরনের কষ্ট পাই আমরা, যেমন হচ্ছে মশার কামড়; এসবের হাত থেকে রেহাই নেই। এগুলি হচ্ছে আধিভৌতিক ক্লেশ; আর আধ্যাত্মিক ক্লেশ হচ্ছে মনের এবং শরীর থেকে যে সমস্ত ক্লেশের উদয় হয়। মন কখনো প্রফুল্ল, আবার কখনো বা বিষণ্ণ শরীর কখনো ভালো, আবার যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো লোকের শারীরিক অবস্থার চূড়ান্ত অবনতি হতে পারে; এসব সংক্রান্ত যে সমস্ত ক্লেশ, তা আধ্যাত্মিক ক্লেশ।– এই তিনটি ক্লেশেই এই জড়জগতরূপ জেলখানায় জীবেদের চরম শাস্তি। যেমন কেউ সরকারের আইন অমান্য করলে জেলে যায় এবং তাকে তার পাপের ফলস্বরূপ শাস্তি পেতে হয়, তেমনি কৃষ্ণবহির্মুখ হয়ে ভোগবাঞ্ছার জন্য যারাই এ জগতে এসেছে, তাদের শাস্তি পেতেই হবে এবং সেই শাস্তি হচ্ছে এই ত্রিতাপ জ্বালা। আরেকটি হচ্ছে জন্ম-মৃত্যু-জরা ব্যাধির শাস্তি; আর এই ত্রিতাপ ক্লেশ ও জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি থেকে চিরতরে মুক্তির কথা শ্রীমদ্ভাগবতে এমন কি গীতাতেও বলা হয়েছে সুন্দরভাবে। ভগবদ্‌গীতাতে বলা হয়েছে– একজন যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমো এই ত্রিগুণের থেকে মুক্ত হয় তখনই সে এই ত্রিতাপ ক্লেশ থেকে মুক্ত হতে পারে; অর্থাৎ গুণাতীত হয়ে ওঠে; যতক্ষণ পর্যন্ত গুণাতীত স্তর লাভ না করা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিতাপ জ্বালা থেকে মুক্তির কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

অতএব এই ত্রিতাপ জ্বালা থেকে মুক্ত হওয়ার কথা শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে বলা হয়েছে–

মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

(১৪/২৬)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যখন কেউ ঐকান্তিকভাবে তার সেবায় নিযুক্ত থাকবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকবে, তখন সে এই গুণাতীত স্তর লাভ করতে পারে। আবার এই গুণাতীত স্তর লাভ করলে তবে সে প্রসন্ন হয়। সে সম্বন্ধে গীতায় বলা হয়েছে–

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম॥

(১৮/৫৪)

অর্থাৎ ব্রহ্মে অবস্থিত অর্থাৎ দেহাভিমানশূন্য প্রসন্ন চিত্ত ব্যক্তি কখনও নষ্ট দ্রব্যের জন্য শোক ও অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনিই সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে আমাতে (ভগবানে) পরা ভক্তি লাভ করেন। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ব্রহ্মভূত স্তর লাভ না করা যাচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না পরমানন্দ লাভ করা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ত্রিতাপ জ্বালা থেকে মুক্তি নেই– রেহাই নেই। শ্রীমদ্ভাগবতেও ত্রিতাপ জ্বালা থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি তার থেকে উন্নত–তার সেবা করা, যে তার থেকে নিম্নগুণসম্পন্ন–তাকে কৃপা করা, সমমৈত্রী ব্যক্তিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। তাই কেউ যদি গুণাতীত স্তরে উন্নীত হতে চায়, তবে তার উচিত তার চেয়ে উন্নত ভক্তদের সেবা করা, আর যারা সমগোত্রীয় তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা আর যারা কনিষ্ঠ, তাদের কৃপা প্রদর্শন করা। এইভাবে যদি কেউ ভক্তিযোগে চালিত হয়, তা হলে সে চির গুণাতীত স্তর লাভ করে অনন্ত শান্তি লাভ করতে পারে।

প্রশ্ন ৮। 'বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মন মলিন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥" – *চৈঃ চঃ*
তবে বিষয়ী লোকের টাকা নিয়ে ইসকন শ্রীধাম মায়াপুরে বিশাল মঠ মন্দির তৈরি করছে, এতে কি কোন দোষ হয় না?

– জগন্নাথ সরকার, জকিগঞ্জ, সিলেট।

উত্তর : বিশেষ রকমের ঝুঁকি নিয়ে কৃষ্ণভক্তরা বিষয়ী-অবিষয়ী নির্বিশেষে প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে কৃষ্ণনাম মহিমা প্রচারের

উদ্দেশ্যে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছেন। উদ্দেশ্য হলো মানুষকে বিষয়-ভোগবাদের অশুভ পরিণতি থেকে উদ্ধার করে কৃষ্ণভক্তির পথে নিয়ে আসা। বিষয়ী বলতে তাদেরই বোঝায়, যাদের বিষয়-ভোগ তৃষ্ণা প্রবল। শ্রীল প্রভুপাদ বিষয়ী তাদেরকে বলেছেন, যারা মাংস খাওয়া, নেশা করা, অবৈধ যৌনসঙ্গ এবং জুয়া কখনো বর্জন করতে চায় না। তাদের চরিত্র কলুষিত হওয়ার ফলে তারা সব সময় ভগবানের ও ভক্তের বিরোধী, কপটাচারী ও কৃপণ প্রকৃতির। অতএব তাদের কাছে ভক্তরা কিছুই গ্রহণ করে না। এমন কি বৈষ্ণব-ভেকধারী বিধিনিষেধ-বিচারবিহীন সহজিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ও বিষয়ীর অন্তর্ভুক্ত। যারা গৃহস্থ অর্থাৎ পরিবারের ব্যয়ভার বহনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন, তাঁদের মোট আয়ের অর্ধাংশ ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত করতে বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব যাঁরা প্রীতি সহকারে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করছেন ভগবানের মন্দির নির্মাণের জন্য, তাঁরা সাধারণ ব্যক্তি নন। বাইরের দৃষ্টিতে বিষয়ী অবিষয়ী পার্থক্য নির্দেশ করাও উচিত নয়। কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন–

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৯/৪১)

ভগবানের অপ্রাকৃত নাম প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে তার প্রকৃত সত্তার কার্যকলাপ সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়। যার ফলে যথার্থই তার উপকার সাধিত হয়। অতএব এই পৃথিবী গ্রহে নাম প্রচারের জন্য ইসকনের যে শুভ প্রয়াস, তার কোনো ক্ষয় নেই। বদ্ধ জীবকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করাই প্রচারের লক্ষ্য। ভগবদ্ মহিমা প্রচারের একটি বিশেষ অঙ্গ হলো ভগবানের সর্বাকর্ষণীয় মন্দির নির্মাণ। ভগবৎ সেবায় অর্থ, শ্রম ইত্যাদি সহযোগিতাই প্রত্যেকের কাম্য। জড় জাগতিক বিষয়ের মোহবন্ধন মুক্ত হলে মানুষ প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, কৃষ্ণসেবাই সহজাত অধিকার। অতএব যাঁরা সহযোগিতা করছেন, তাতে কারও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎকশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥

"হে পার্থ, শুভানুষ্ঠানকারী পরমার্থবিদের ইহলোক এবং পরলোকে কোন দুর্গতি হয় না। হে বৎস, তার কারণ, কল্যাণকারীর কখনো অধোগতি হয় না।" (গীতা ৬/৪০)

কিন্তু যাঁরা শ্রীমন্দির নির্মাণ তথা অন্যান্য প্রচার কার্যে আন্তরিক আগ্রহভরে মুক্ত হস্তে অর্থ-শ্রম-সহানুভূতি সহযোগিতা করছেন, তাঁদের বিষয়ী ভেবে অবহেলা করা বা তাঁদের দেওয়া উপযুক্ত দ্রব্যকে বিষয় জ্ঞানে অবহেলা করার কোনো যুক্তি নেই। বরং শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে–

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

অর্থাৎ "যখন কোনও কিছুর প্রতি মানুষের আসক্তি থাকে না; কিন্তু সেই সময়ে যে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় সব কিছু গ্রহণ করে, তখন সে যথার্থই সকল আসক্তির উর্ধ্বে অবস্থান করে থাকে। আর অন্যদিকে, যে ব্যক্তি সব কিছু বর্জন করছে অথচ সেগুলির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই তার নেই, তা হলে বুঝতে হবে, তার বৈরাগ্য সম্পূর্ণ হয় নি।"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব ২/২৫৫-২৫৬)

তাই আমাদের গুরু-আচার্য ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গোস্বামী লিখেছেন–

"হরি-সেবায় যাহা হয় অনুকূল।
বিষয় বলিয়া তার ত্যাগে হয় ভুল ॥"

(বৈঃ শ্লোঃ ৩০ পৃঃ ৩৯৪)

কৃষ্ণসেবার অনুকূল বস্তুকে যদি কেউ বিষয় জ্ঞানে পরিত্যাগ করে, তবে তা বড়ই ভুল করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, কপটাচারী উৎপাত সৃষ্টিকারী বিধিবিচারহীন অবৈষ্ণব বিষয়ীদের অন্ন ভক্তরা কখনই গ্রহণ করতে যান না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তরা বিষয়ীর সঙ্গ প্রভাবে হয় তো কৃষ্ণভক্তির পথ থেকে বিচ্যুতি হতে পারে। অতএব সাবধান বাণীর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু ভগবৎ সেবার জন্য অনুকূল বা উপযুক্ত বস্তু গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয় নি। বিশেষ করে, একজন মহাভাগবতের কাছে কোন কিছুই জড় বিষয় নয়। তথাকথিত বিষয়ীদের প্রদত্ত বিষয়কে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় লাগাতে জানেন। তখন সেই বিষয় আর বিষয় থাকে না, তা চিন্ময় হয়ে যায়।

প্রশ্ন : ৯ (ক) মানুষ মৃত্যুর পর কী নিয়ে পরপারে যেতে পারে?

(খ) মহাদেবের বাহন বলে ষাঁড়কে সবাই নমস্কার করে, কই অন্য দেবতার বাহনকে তো নমস্কার করতে দেখি না? যেমন, লক্ষ্মীদেবীর বাহন– পেঁচা, শনিদেবের বাহন–গৃধিনী পাখি, দুর্গাদেবীর বাহন–সিংহ, শীতলার বাহন–গাধা, গণেশের বাহন–ইঁদুর ও সরস্বতীদেবীর বাহন–হাঁস, এঁদের তো নমস্কার করতে দেখি না?

– হরেকৃষ্ণ দাদু, তারাগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : (ক) পরপার বলতে বুঝায় এই জড় জগতের উল্টো দিকে অবস্থিত ভগবদ্ধাম বা চিন্ময় জগৎ– যে স্থান থেকে পতিত হয়ে আমরা এই অনিত্য জড় জগৎ-রূপ জেলখানায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে আছি। কৃষ্ণবিস্মৃতিই এই ভৌতিক জগতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকার একমাত্র কারণ।

পরপার হচ্ছে চিন্ময় ধাম বা চেতন জগৎ। এই জড় জগতের কোনো কিছু সঙ্গে নিয়ে চিজ্জগতে প্রবেশ করা যায় না। কামিনী, কাঞ্চন, দারা, সুত, পুত্র ও বিত্ত এই সকল কিছুই সঙ্গে যাবে না। দশ ইন্দ্রিয়যুক্ত এই স্থূল দেহ, এমনকি চিন্ময় আত্মার প্রথম আবরণ মন-বুদ্ধি-অহংকারাত্মক সূক্ষ্ম দেহটি পর্যন্ত সেই সনাতন ধাম বৈকুণ্ঠ বা তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবনে প্রবেশ করতে পারে না।

ভগবান কৃষ্ণের তটস্থা শক্তিজাত, বিভিন্নাংশ, সচ্চিদানন্দময় আত্মাই একমাত্র এই জগতের পরপারে ভগবৎ রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে। সেই চিজ্জগতে প্রবেশ করে ভগবান কৃষ্ণের অণুসদৃশ আত্মা জড় দেহের পরিবর্তে একটি সৎ, চিৎ ও আনন্দময় দেহ প্রাপ্ত হয়। আর সেই চিন্ময় ধামে প্রবেশের একমাত্র পাথেয় হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণসেবা।

(খ) **'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু'**– দেবাদিদেব শিব হচ্ছেন পরম বৈষ্ণব, এবং তিনি দ্বাদশ মহাজনদের মধ্যে অন্যতম। যেই ষাঁড়টি পরম বৈষ্ণব মহাদেবের সেবায় রত, সেই ষাঁড়টি সকলের পূজ্য হতে পারে, কিন্তু সেই-জন্য সকল ষাঁড় পূজনীয় হবে কেন?

ষাঁড় যে সকলের পূজনীয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ষাঁড় যে নমস্য তার প্রধান কারণ– ষাঁড় হচ্ছে আমাদের সকলের পিতা, আর গাভী হচ্ছে আমাদের সকলের মাতা। খাদ্য ছাড়া আমরা

জীবন ধারণ করতে পারি না, তার জন্য দরকার জমির ফসল! জমিতে ফসল তৈরি করতে গেলে জমি চাষের একান্ত প্রয়োজন, আর জমি চাষের জন্য সাহায্য করে থাকে এই ষাঁড়। সেইজন্য ষাঁড় হচ্ছে মানব সমাজের পিতা। তাই আমরা ষাঁড়কে পূজা করি। আপন পিতাকে হত্যা করলে যেমন মহা পাপের ফলে নরকে শাস্তি পেতে হয়, তেমনি ষাঁড় হত্যা করলে নরকে বহুকাল কষ্টভোগ করতে হয়।

প্রশ্ন : ১০ (ক) তুলসীদেবী বৃক্ষরূপ ধারণ করলেন কেন? (খ) তুলসীর মাহাত্ম্য কী?

– শ্রীকৃষ্ণমোহণ খাঁ, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : ১০ (ক) তুলসী অত্যন্ত পবিত্র বৃক্ষ। ত্রিজগৎকে পাবন করবার জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ইচ্ছায় তাঁর বক্ষবিলাসী মহালক্ষ্মী এই জগতে অবতীর্ণ হয়ে পরে বৃক্ষরূপ ধারণ করেছিলেন। শ্রীবিষ্ণুর ইচ্ছাতে কিভাবে লক্ষ্মীদেবী অভিশপ্ত হয়ে এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন পুরাণের এই কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণিত হলো :

সরস্বতী, গঙ্গা ও লক্ষ্মী তিন জনেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি অতিশয় সেবাপরায়ণা ছিলেন। গঙ্গাদেবী প্রণয়ের আবেশে শ্রীবিষ্ণুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, সরস্বতী তা দর্শন করে ক্রোধান্বিত হয়ে বলপূর্বক গঙ্গাকে শ্রীবিষ্ণুর সান্নিধ্য থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলে, লক্ষ্মী সরস্বতীকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। ফলে তাঁর ক্রোধানল লক্ষ্মীর উপর বর্ষিত হয়, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বলেন, "যাও মর্তলোকে গিয়ে তুলসী বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ কর।" তেমনি– একে অপরের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে সরস্বতী ও গঙ্গা এই মর্ত্যলোকে নদীরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

অভিশপ্ত হয়ে লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠ জগৎ থেকে এই মর্ত্যলোকে অবতরণ সম্পূর্ণ চিন্ময় স্তরের এবং ভগবানের ইচ্ছাতেই তা সম্পন্ন হয়েছে। কেননা জগতের বদ্ধজীবের মঙ্গলের জন্য লক্ষ্মীদেবী এইভাবে অবতরণের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

তারপর ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মীদেবীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন–"হে দেবী, চিন্তার কোনো কারণ নেই। বিধাতাই সবকিছুর কারণ। তুমি মর্ত্যলোকে যাও এবং ধর্মধ্বজের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ কর। দৈবের কৃপায় সেখান থেকে তুমি পবিত্র তুলসী বৃক্ষরূপে রূপান্তরিত হবে এবং তোমার প্রভাবে ত্রিজগৎ পবিত্র হবে। তুমি যখন তুলসী নাম ধারণ করে জীবন অতিবাহিত করতে থাকবে, তখন আমারই স্বরূপ-শক্তির অংশ প্রকাশরূপে সুদামা শঙ্খচূড় দৈত্যরূপে জন্মগ্রহণ করবে এবং তোমাকে বিবাহ করবে। তারপর তুমি আমার কাছে আবার ফিরে আসবে।"

রাজা ধর্মধ্বজের ঔরসে এবং মাধবীর গর্ভে মহালক্ষ্মী কন্যা সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। জন্মের মুহূর্ত থেকেই কন্যাটিকে দেখতে অতি সুশ্রী ও পরিণত বয়স্ক বলে মনে হোত। কন্যাটির নাম ছিল 'তুলসী', যার অর্থ অতুলনীয়া। জড় জগতের সমস্ত বৈভব ত্যাগ করে ভগবান বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করবার বাসনায় তুলসীদেবী হাজার হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করলেন। সেই সময় ব্রহ্মা স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। তিনি বর প্রার্থনা করলেন যে ভগবান বিষ্ণুকে তিনি পতিরূপে লাভ করতে চান। এই প্রার্থনা শুনে লোকপতি ব্রহ্মাজী বললেন, "দেবী, শ্রীমতী রাধারাণীর অভিশাপে শ্রীকৃষ্ণের অংশ প্রকাশরূপে গোপ বালক সুদামা শঙ্খচূড় দৈত্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। সে অত্যন্ত উপযুক্ত পাত্র এবং গোলোকে তোমার প্রতি সে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল। এখন সেই শঙ্খচূড় তোমার পতি হবে, তারপর তুমি ভগবান নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করবে। সেইজন্য তোমার দিব্যদেহের একটি অংশ এই পৃথিবীতে তুলসী বৃক্ষরূপে প্রকাশিত হবে। আর এই বৃক্ষ হবে সকল বৃক্ষের মধ্যে পবিত্রতম এবং এই বৃক্ষ ভগবান বিষ্ণুর অতি প্রিয় এবং তুলসী পত্র ছাড়া ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা ফলপ্রসূ হবে না।"

এদিকে শ্রীমতী রাধারাণীর অভিশাপে সুদামা রাখাল বালক শঙ্খচূড় দানবরূপে জন্ম লাভ করে ও বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যা করে 'বিষ্ণুকবচ' লাভ করলেন এবং তুলসীদেবীকে বিবাহ করলেন। শঙ্খচূড় আরো বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, দুটি কারণে সে নিধন প্রাপ্ত হবে– যদি বিষ্ণুকবচ তার দেহ থেকে অপহৃত হয় অথবা তার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হয়। এদিকে শঙ্খচূড়ের প্রবল বিক্রমে দেবতারা স্বর্গচ্যুত হলো, এবং তাঁরা লোকপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। তখন ব্রহ্মা, শিব ও দেবতারা একত্রিত হয়ে বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে শরণাপন্ন হলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু শিবকে পাঠালেন শঙ্খচূড়ের সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্য আর তিনি স্বয়ং নিজে যাচ্ছেন শ্রীমতী তুলসীদেবীর সতীত্ব নষ্ট করতে। এইভাবে তিনি দেবতাদের আশ্বস্ত করলেন।

এদিকে শঙ্খচূড় দানব তুলসীদেবীর কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, আর এই সুযোগে ভগবান বিষ্ণু শঙ্খচূড়ের রূপ পরিগ্রহ করে তুলসীদেবীর সতীত্ব নষ্ট করলেন। তুলসীদেবী তা বুঝতে পেরে অভিশম্পাৎ করতে যেই যাবেন, তৎক্ষণাৎ ভগবান বিষ্ণু তাঁর চতুর্ভুজরূপ ধারণ করলেন এবং তুলসীদেবীকে বললেন– "হে দেবী, আমাকে পতিত্বে বরণ করবার জন্য তুমি কঠোর তপশ্চর্যা করেছিলে, আর তোমার পতি শঙ্খচূড় ইতিমধ্যেই দেবাদিদেব মহাদেবের ত্রিশূলে নিধন প্রাপ্তি হয়ে, তার পূর্বের চিন্ময় স্বরূপ রাখাল বালক, সুদামা রূপে গোলোকে ফিরে গিয়ে আমার নিত্য পার্ষদরূপে অবস্থান করবে। আর এখন তুমি এই শরীর পরিত্যাগ করে আমার সাথে বৈকুণ্ঠে যাবে এবং সেখানে তুমি আমাকে নিত্যকাল পতিরূপে সেবা করবে।"

(খ) শ্রীতুলসী ভগবান শ্রীহরির অতি প্রিয়া, সেই জন্য শ্রীহরির সেবার জন্য তুলসী-সেবন শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। চিন্ময় বস্তু হলেও ভগবান কৃষ্ণে নিবেদিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ ও চর্বণ যেমন অপরাধজনক নয়, তদ্রূপ তুলসী ক্ষেত্রেও অপরাধজনক নয়। ভোগবুদ্ধির সহিত তুলসী ভক্ষণ অপরাধ জনক।

তুলসী পত্র ভক্ষণপূর্বক অন্তিম সময়ে দেহত্যাগ করলে চণ্ডালেরও সমগ্র পাপ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে যায়। গঙ্গা ও যমুনার শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ জল যেরূপ সর্ব পাপ বিদূরিত করে দেয়, তদ্রূপ তুলসীদল–ভোজনদ্বারা নিখিল পাপ ক্ষয় হয়ে যায়। যমরাজ যমদূতগণের উদ্দেশ্যে বলছেন–"হে যমদূতগণ, যেকাল পর্যন্ত মানবের বদনে ও মস্তকে তুলসীদল বিরাজিত না হয়, সে-কাল পর্যন্ত দেহে পাপ অবস্থান করে।"

অমৃত হতে সমুত্থিতা বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসীকে স্মরণ, কীর্তন ও ভক্ষণ করলে সেই ব্যক্তির সকল অভীষ্ট পূরণ হয়। তুলসী বৃক্ষের পত্র, ফুল, শিকড়, ডালপালা, বৃক্ষের ছাল, এমনকি বৃক্ষের নিচের মাটি পর্যন্ত অতি পবিত্র। তুলসী কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী। শাস্ত্রে এই ধরনের অসংখ্য তুলসীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। তুলসী মহারাণী কি?–জয়। ধন্যবাদ! হরেকৃষ্ণ!

প্রশ্নোত্তরে : সনাতন গোপাল দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থসমূহের বৈশিষ্ট্য

বৈদিক শাস্ত্রসমূহ হচ্ছে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ আধার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক ভারতবর্ষ তার সেই সনাতন সংস্কৃতির প্রতি উদাসীন। আর তথাকথিত যে সমস্ত পণ্ডিত শাস্ত্র-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার অভিনয় করছে, তাদের সেই অপচেষ্টার প্রভাবে বৈদিক তত্ত্বদর্শন বিকৃত হয়ে এক উদ্ভট রূপ ধারণ করেছে।

তাই ভারতবর্ষ আজ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বর্জিত হয়ে এক চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে। আর ভারতের এই দুর্দশার ফলে সমস্ত পৃথিবী ক্লিষ্ট হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবের গ্লানি থেকে জগতকে উদ্ধার করার জন্য ভারতের পূর্ব দিগন্তে সূর্যের মত উজ্জ্বল এক মহাপুরুষের উদয় হয়েছে—তিনি হচ্ছেন জগদগুরু শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। মূল বৈদিক সাহিত্যগুলি সংস্কৃত থেকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য সরল ভাষায় অনুবাদ করে তিনি সমস্ত জগৎ জুড়ে তা বিতরণ করেছেন। তার ফলে সারা পৃথিবীর বুদ্ধিমান মানুষেরা বৈদিক তত্ত্ব-দর্শনের পরম উৎকর্ষ উপলব্ধি করে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য বৈদিক সনাতন ধর্ম অবলম্বন করেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বৈদিক শাস্ত্রের জ্ঞান অবিকৃতভাবে পরমেশ্বর ভগবান ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধারায় অত্যন্ত সরলভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন, যা পাঠ করলে নিঃসন্দেহে নিত্য জ্ঞানময় এবং আনন্দময় জীবন লাভ করা যায়।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর তালিকা ও ভিক্ষা মূল্য

ক্রঃ নং	গ্রন্থ তালিকা	ভিক্ষা
১	কৃষ্ণ আর্ট বুক	১০,০০০/=
২	শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় সেট	২,৫৫০/=
৩	শ্রীমদ্ভাগবত ২য় সেট	২,৩৫০/=
৪	শ্রীমদ্ভাগবত ১ম সেট	২৩০০/=
৫	শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত সেট	২৫০০/=
৬	শ্রীমদ্ভগবদগীতা সুপার ডিলাক্স	৪০০/=
৭	শ্রীমদ্ভগবদগীতা ডিলাক্স	৩৫০/=
৮	শ্রীমদ্ভগবদগীতা ম্যারাথন	২০০/=
৯	লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ	৩৫০/=
১০	প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন	৩০০/=
১১	কৃষ্ণ ভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান	১৫০/=
১২	পঞ্চরাত্রিক প্রদীপ	১৮০/=
১৩	ভক্তিরসামৃত সিন্ধু	১৪০/=
১৪	ভক্তবৎসল ভগবান	১৪০/=
১৫	যুগধর্ম	১৪০/=
১৬	জীবন জিজ্ঞাসা	১৩০/=
১৭	আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা	১৩০/=
১৮	শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা	১০০/=
১৯	বৈষ্ণব শ্লোকাবলী	১০০/=
২০	প্রভুপাদ	১৩০/=
২১	ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন	১০০/=
২২	গীতা কোর্স	১০০/=
২৩	বৈষ্ণব কে?	৯০/=
২৪	গীতার মাহাত্ম্য	৮০/=
২৫	কুন্তী দেবীর শিক্ষা	৯০/=
২৬	গীতার রহস্য	৮০/=
২৭	পঞ্চতত্ত্বরূপে ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু	৮০/=
২৮	যোগসিদ্ধি	৮০/=
২৯	শ্রীঈশোপনিষদ	৮০/=
৩০	কৃষ্ণভক্তি প্রচারে পরোপকার	৮০/=
৩১	কপিল শিক্ষামৃত	৮০/=
৩২	গৃহে বসে কৃষ্ণ ভজন	৮০/=
৩৩	পরম সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদ	৭৫/=
৩৪	হরেকৃষ্ণ চ্যালেঞ্জ	৫০/=
৩৫	জীবন আসে জীবন থেকে	৫০/=
৩৬	কৃষ্ণ প্রসাদে পরম শান্তি	৬০/=
৩৭	কৃষ্ণভাবনামৃত	৫০/=
৩৮	দামোদর	৫০/=
৩৯	একাদশী মাহাত্ম্য	৪০/=
৪০	বৈষ্ণব সদাচার	৪০/=
৪১	নামহট্ট দীপিকা	৩০/=
৪২	ভক্ত্যালোক	৩০/=
৪৩	গুরু কৃপা লাভের পন্থা	৩০/=
৪৪	মায়াপুর দর্শন	৩৫/=
৪৫	মাধুর্য কাদম্বিনী	২৫/=
৪৬	ঈশ্বরের সন্ধানে	২৫/=
৪৭	আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর	৩০/=
৪৮	বৈদিক সাম্যবাদ	২৫/=
৪৯	ভক্তি রত্নাবলী	২০/=
৫০	কৃষ্ণভক্তি রত্নাবলী	২০/=
৫১	জাগ্রত চেতনা	২০/=
৫২	উপদেশামৃত	২০/=
৫৩	অমৃতের সন্ধানে	২০/=
৫৪	ভক্তি কথা	২০/=
৫৫	ভগবানের কথা	২০/=
৫৬	ভক্তিবেদান্ত রত্নাবলী	২০/=
৫৭	আদর্শ গৃহস্থ জীবন	২০/=
৫৮	যুগাচার্য শ্রীল প্রভুপাদ	১৫/=
৫৯	ভক্ত প্রশিক্ষণ	১৫/=
৬০	জগন্নাথ দেবের প্রকাশ	১৫/=
৬১	বৈষ্ণব শিক্ষা ও সাধনা	১৫/=
৬২	শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ও জীবনী	১৫/=
৬৩	গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদ্যাবলী	১৫/=
৬৪	শ্রী কৃষ্ণের সন্ধানে	২০/=
৬৫	অনুপম উপহার	২০/=
৬৬	অর্চন পদ্ধতি	১৫/=
৬৭	বুদ্ধিযোগ	২০/=
৬৮	একাদশী মাহাত্ম্য (বাংলা)	২০/=
৬৯	জ্ঞান কথা	১৫/=
৭০	কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের পন্থা	২০/=
৭১	পরলোকে সুগম যাত্রা	৩৫/=
৭২	অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ	৩০/=
৭৩	ভক্তবৎসল নৃসিংহদেব	৪০/=

সম্পাদকীয়

প্রকৃত সুখের সন্ধানে

ভগবান প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা দিয়েছেন, তাই কেউ যদি জড়-সুখ ভোগ করার জন্য কোনো দেবতার পূজা করতে চায়, তখন ভগবান, যিনি সকলের অন্তরেই পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন, তাদের সেই সমস্ত দেবতাদের পূজা করার সব রকম সুযোগ-সুবিধা দান করেন। সর্বজীবের পরম পিতা ভগবান কখনও তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। পক্ষান্তরে-তিনি তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার সব রকম সুযোগ-সুবিধা দান করেন। এই সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, জড়-সুখভোগ করার ফলে জীব যদি মায়ার ফাঁদে পতিত হয়, তা হলে সর্বশক্তিমান ভগবান কেন তাদের এই পথে এগিয়ে নিয়ে চলেন? এর উত্তর হচ্ছে, পরমাত্মারূপে ভগবান যদি সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা না দিতেন, তা হলে জীবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোনই মূল্য থাকত না। তাই তিনি স্বেচ্ছানুরূপ আচরণ করার জন্য প্রতিটি জীবকেই পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দান করেন। কিন্তু তাঁর পরম নির্দেশ আমরা ভগবদ্গীতাতে (১৮/৬৬) পাই–

'সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।'

'সব কিছু পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও।' আর মানুষ যদি তা করে, তা হলেই সে সুখী হতে পারে।

জীবাত্মা এবং দেবতা, এরা উভয়েই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ইচ্ছার অধীন। তাই জীব নিজের ইচ্ছার ফলে দেব-দেবীর পূজা করতে পারেন না এবং দেব-দেবীরাও ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত বর দান করতে পারে না। ভগবান বলেছেন যে, তাঁর ইচ্ছা বিনা একটা পাতাও নড়ে না। সাধারণত সংসারে বিপদগ্রস্ত মানুষেরাই বৈদিক নির্দেশ অনুসারে দেবোপাসনা করে। যেমন, রোগ নিরাময়ের জন্য রোগী সূর্যোপাসনা করে, বিদ্যার্থী বাগদেবী সরস্বতীর পূজা করে, সুন্দরী স্ত্রী লাভ করার জন্য শিব-পত্নী উমার পূজা করা হয়। এইভাবে শাস্ত্রে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করার বিধান দেওয়া আছে।

প্রতিটি জীবই কোন বিশেষ প্রাকৃত সুখ উপভোগ করার অভিলাষী হয়। তাই ভগবান তাদের অন্তরে বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীর প্রতি অচলা শ্রদ্ধা দান করে তাঁদের উপাসনা করতে অনুপ্রাণিত করেন এবং তার ফলে তারা সেই সমস্ত দেব-দেবীর কাছ থেকে বর লাভ করতে সমর্থ হয়। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর প্রতি জীবের যে অনুরাগ জন্মায়, তা ভগবানেরই দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। দেব-দেবীরা তাঁদের নিজেদের শক্তির প্রভাবে জীবকে তাঁদের প্রতি অনুরক্ত করতে পারেন না। জীবের অন্তরে পরমাত্মারূপে বিদ্যমান থেকে শ্রীকৃষ্ণই মানুষকে দেবোপাসনায় অনুপ্রাণিত করেন।

দেবতারা বস্তুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের বিভিন্ন অঙ্গ, তাই তাঁদের কোনই স্বাতন্ত্র্য নেই। বেদে বলা হয়েছে, 'পরমাত্মারূপে ভগবান দেবতাদের হৃদয়েও বিরাজ করেন, তাই তিনিই বিভিন্ন দেব-দেবীর মাধ্যমে জীবের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। এইভাবে দেবতা এবং জীবাত্মা এরা কেউই স্বাধীন নয়, তারা সকলেই ভগবানের ইচ্ছার অধীন।'

ভগবানের অনুমতি ছাড়া দেব-দেবীরা তাঁদের ভক্তদের কোন রকম বর দান করে পুরস্কৃত করতে পারেন না। পরমেশ্বর ভগবানই যে সব কিছুর অধীশ্বর, সেই কথা জীব ভুলে যেতে পারে কিন্তু দেবতারা তা ভোলেন না, তাই বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই

ব্যবস্থানুসারে সাধিত হয়। এই ব্যাপারে দেব-দেবীরা হচ্ছেন উপলক্ষ্য মাত্র। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা সেই কথা জানে না, তাই তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর শরণাপন্ন হয়। কিন্তু শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের যখন কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তখন তিনি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কাছে সেই জন্য প্রার্থনা করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত অবশ্য কখনই দেব-দেবীর কাছে জাগতিক সুখ-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করেন না। কিন্তু জীব মাত্রই দেবতাদের শরণাপন্ন হয়, কারণ তারা কামনা চরিতার্থ করার জন্য মত্ত হয়ে থাকে। এটা তখনই হয়, যখন সে কোন ভ্রান্ত অনর্থ কামনা করে, যার পূর্তি ভগবান নিজে করেন না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ ভগবানের আরাধনা করে সেই সঙ্গে জড়-সুখ কামনা করে, তবে তা পরস্পরবিরোধী এবং অসঙ্গত। পরমেশ্বরের ভক্তিসেবা আর দেব-দেবীদের উপাসনা একই পর্যায়ে হতে পারে না, কারণ দেবোপাসনা হল জড়জাগতিক প্রাকৃত, আর ভগবদ্ভক্তি হল সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত।

যে জীব তার যথার্থ আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চায়, তার কাছে জাগতিক কামনা-বাসনাগুলি হচ্ছে এক-একটি প্রতিবন্ধক। তাই শুদ্ধ ভক্তকে ভগবান জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগৈশ্বর্য দান করেন না। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা আবার সেইগুলিই লাভ করবার জন্য দেবোপাসনায় তৎপর হয়।

ভগবদ্গীতার কোন কোন ভাষ্যকার বলেন যে, কোন দেব-দেবীর উপাসনা যে করে, সে-ও ভগবানের কাছে যেতে পারে, কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে, দেবোপাসকেরা সেই সমস্ত গ্রহলোকে যায়, যেখানে তাদের উপাসিত দেব-দেবীরা অধিষ্ঠিত। যেমন সূর্য-উপাসকেরা সূর্যলোকে যায়, চন্দ্রের উপাসকেরা চন্দ্রলোকে যায়। তেমনই কেউ যদি ইন্দ্রের উপাসনা করে, তা হলে সে ইন্দ্রলোকে যেতে পারে। এমন নয় যে, যে-কোন একটা দেব-দেবীর পূজা করলেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে পৌছানো যায়। এখানে সেই কথা অস্বীকার করা হয়েছে। ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসকেরা এই জড় জগতের ভিন্ন ভিন্ন গ্রহলোক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত সরাসরিভাবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ধামে গমন করেন।

(বাকি অংশ ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ত্রৈমাসিক

বৈদিক তত্ত্বদর্শনের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পত্রিকা-

অমৃতের সন্ধানে

আপনাকে প্রকৃত শান্তি লাভের সন্ধান দিচ্ছে, কিভাবে এই দুঃখময় জগতে থেকেও চিরসুখী হওয়া যায়-

এতে থাকছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনতত্ত্ব ব্যাখ্যা, দেশ-বিদেশের খবর এবং অন্যান্য কৃষ্ণভাবনামৃত প্রবন্ধ, কাহিনী, এবং কৃষ্ণভক্তের জীবন-চরিত, এছাড়া আরও অনেক কিছু।

অত্যন্ত প্রাঞ্জল পত্রিকাটি সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এবং বহু মণিষী এই পত্রিকাটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে' পত্রিকাটির বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা- রেজিঃ ডাকে ১১০/- টাকা, পাঁচ বৎসরের জন্য ৫০০/- টাকা, ১০ বৎসরের জন্য ১০০০/- টাকা এবং সারা জীবনের জন্য ৫০০০/- টাকা। প্রতি কপি পত্রিকার ভিক্ষা মূল্য ২০/- টাকা। বছরের যে কোন সময় ডাকযোগে গ্রাহক হওয়া যায় এবং যে কেউ নূন্যতম ১৫কপি পত্রিকা পর্যন্ত ভিপি ডাকযোগে গ্রহন করার মাধ্যমে এজেন্ট হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত মহিমা প্রচারে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

-ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ-

শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির
৫, চন্দ্রমোহন বসাক ষ্ট্রীট, বনগ্রাম (ওয়ারী) ঢাকা-১২০৩

স্বামীবাগ আশ্রম
৭৯/১, স্বামীবাগ রোড, ঢাকা-১১০০, ফোনঃ ৭১২২৪৮৮

ধ্যানস্থ যোগী জড়দেহ ত্যাগ করে
উর্দ্ধলোকে গতি হচ্ছে...
কিন্তু এই কলিযুগে ধ্যানযোগ অতি
কষ্টসাধ্য বিধায় ভক্তিযোগই শ্রেয়